ডঃ তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী
ডঃ ইমাদ আল্ দীন খলিল

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

কোরআন ও সুন্নাহ

স্থান-কাল প্রেক্ষিত

মূল

ডঃ তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী

ডঃ ইমাদ আল্ দীন খলিল

অনুবাদ

শেখ এনামুল হক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশকের কথা

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (International Institute of Islamic Thought) আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের বর্তমান নৈরাজ্যকর, ধর্মহীন ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির উপর পনুঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি, আই, আই, টি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বি আই আই টি উক্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে যাচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থ 'কোরআন ও সুন্নাহঃ স্থান-কাল প্রেক্ষিত" এর অন্যতম উদ্যোগ। ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী এবং ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনায় কোরআন ও সুন্নাহর প্রেক্ষাপটে বর্তমান স্থান কালের বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণার বিভিন্ন দিক নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইসলামী গ্রন্থারাজীর চাহিদা অনেকটা পূরণ করছে। এ ক্ষেত্রে বি আই আই টি-র প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য হল, এটা এক বিশেষ লক্ষ্য অভিসারী এবং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক। আকারে ক্ষুদ্র হলেও বাংলা ভাষা-ভাষী চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানমনা মানুষের নিকট এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটি ইংরেজীতে লেখা এবং অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শেখ এনামুল হক। গ্রন্থখানি পাঠকদের আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে কিছুটা সহায়ক হলে সংশ্লিষ্ট সবার শ্রম সার্থক মনে করব। পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

ড. মোঃ লুৎফর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

অনুবাদকের নিবেদন

বর্তমান বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের (Resurgence) প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের এক মহৎ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে একেবারে পিছিয়ে নেই। এই মহতি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সাথে যোগ হয়েছে আরো একটি নাম-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (Bangladesh Instiute of Islamic Thought). ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যেই ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজীতে বেশ ক'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং বাংলা ভাষায়ও গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এ দেশের ইসলামী সাহিত্যের অঙ্গনে নিঃসন্দেহে এটা হবে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আই আই আই টি লন্ডন অফিস থেকে প্রকাশিত The Qur'an and The Sunnah : The Time-Space Factor শীর্ষক গ্রন্থখানি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থটিতে ভূমিকা ছাড়াও প্রখ্যাত ইরাকী পন্ডিতদ্বয়-ডঃ তাহা জাবির আল আরওয়ানীর The Primary Source of Knowledge'and Toward a Proper Reading of the Sunnah` এবং ডঃ ইমাদ আল দীন খলিলের The Qur`an and Modern Science: Observations on Methodology শীর্ষক নিবন্ধ রয়েছে এবং এগুলি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে।

অনুবাদ বা রূপান্তর নিঃসন্দেহে এক কঠিন কাজ। মূল বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাসম্ভব সাবলীল ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। ইংরেজী থেকে কুরআনের আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী'র তাফহীমুল কোরআন এবং প্রখ্যাত আলেম মুফতি মোহাম্মদ শফী'র মা'রেফুল কুরআনের অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি সম্ভবত ঃ এত শীঘ্র অনুবাদ হতো না, যদি বি আই আই টির সহকারী মহাসচিব অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদারের অহরহ তাগিদ না থাকতো। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। বইটি বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে পাঠকদের পিপাসা কিঞ্চিত পূরণ করতে সক্ষম হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শেখ এনামুল হক

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বহুদিন পর্যন্ত উম্মাহ্‌র শক্তি-সামর্থ, বিশুদ্ধতা, জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার মহান উৎস কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান গবেষণা করা হয় নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব চৌহদ্দি পেরিয়ে অথবা তাদের বহুমুখী বিষয়ের দু'একটি শাখা, প্রশাখায় অতিরিক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করে শ্বাশ্বত ঝরণার উৎসের ব্যাপক সম্ভাবনার প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে; অপরদিকে উম্মাহ্‌, তথা সমগ্র বিশ্বকে তার ব্যাপক উপযোগিতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বর্তমানে ইতিহাস ও সভ্যতার বিকাশে উম্মাহ্‌র নেতৃস্থানীয় ভূমিকার পুনরুজ্জীবনে সে তার নিজস্ব সমস্যা ও সুপ্ত ক্ষমতা ও আকাংখার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই ঝরণা থেকে পানি আহরণের বিষয়টি এখন অধিকতর সময়োচিত ও জরুরী। এই দুই উৎসের পুনঃপরিদর্শন এখন কোনক্রমেই সেকেলে, অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক, অতীত স্মৃতি রোমন্থন বা পলায়নী মনোবৃত্তি নয় বরং, আবিষ্কারের পথে এক মহাযাত্রা যাতে আছে অজস্র পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। আর আবিষ্কারের বহু মহাযাত্রার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও আসতে পারে বিবিধ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক, তবে দৃঢ় ইচ্ছায় বলিয়ান হয়ে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে মহানিয়ন্তা এবং সকল পরিব্রাজকের আলোকবর্তিকায় রহমত ও করুণার বদৌলতে খালি হাতে, শূন্য মনে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

বস্তুতঃ এর পুরস্কারেরও শেষ নেই। মানুষের সুপ্তশক্তি ও খোদার পরিকল্পনার উন্নততর উপলব্ধি; ভারসাম্যপূর্ণ, সক্রিয় ও উদ্দেশ্যমূলক জীবনের পুনরুজ্জীবন, মর্যাদা, শান্তি ও সম্প্রীতির পুনরুদ্ধার শুধু উম্মাহর নয় বরং সমগ্র বিশ্বের যে বিশ্ব ভ্রান্ত আদর্শ ও ধারণায় বিভ্রান্ত হয়েছে বারবার।

বাস্তবতা এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র উজ্জ্বলতর অধ্যায়সমূহে অতীতের অভিযাত্রার (গবেষণা ও পর্যালোচনা) মাধ্যমে সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের গতিশীলতা এবং পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং বর্তমান কালের চাহিদা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলমানদের সামর্থকে শাণিত ও প্রাণবন্ত করে তুলবে। এই অভিযাত্রায় সংশ্লিষ্ট মানবিক ও আপেক্ষিক পরিমন্ডলে আমাদেরকে মুসলমান ও মানব সমাজের ঘনিষ্ঠ হতে এবং আরো উচ্চতর ক্ষেত্রে-সর্বোচ্চ পর্যায়ে সকল জীবন ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টিকর্তার কাছে নিয়ে যাবে।

এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী আল্লাহর নাযিলকৃত ও সুরক্ষিত কোরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা এমন

এক উৎস যা থেকে সুষ্ঠু অধ্যয়নের মাধ্যমেই সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ডঃ আলওয়ানী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোরআন অধ্যয়নের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের চর্চা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে খলিফা হিসেবে মানুষকে পৃথিবীতে বাস্তব কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশ্বজাহান অধ্যয়নের আহবান জানানো হয়েছে। এই উভয় অধ্যয়ন একত্রে সম্পাদন এবং তাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যেই এই পৃথিবী ও পরজগতের কল্যাণ নিহিত।

ইতিপূর্বেকার মুসলমানগণ কোরআন ও কেয়ামতের বিভিন্ন দিকের ওপর মূলতঃ মনোনিবেশ করেছেন এবং নাযিলকৃত অহীকে ফিকাহ ও আইন কানুনের উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। কোরআনের এ ধরনের সীমিত অধ্যয়ন বহুকাল ধরে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে তার উপযোগিতা নিরূপণের উৎসাহ উদ্দীপনাকে দমিয়ে রাখে। এ জন্য ডঃ আলওয়ানী এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে কোরআনকে বিশুদ্ধ উপায়ে অনুধাবন করা যায়।

অনুরূপভাবে ডঃ আল আলওয়ানীর দ্বিতীয় নিবন্ধ 'সুন্নাহ্‌র সুষ্ঠু অধ্যয়ন'-থেকে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রসূল হওয়ার লক্ষ্য অনুধাবনের অনুকূল হবে এবং আমাদের কালের ও স্থানের বাস্তব চাহিদা অনুসারে সুন্নাহ্‌র চেতনার যুক্তিসঙ্গত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ডঃ ইমাদ আল দ্বীন খলিল তার নিবন্ধে কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন, কোরআন ও বিজ্ঞানের কোন পাঠ্যপুস্তক নয়, তবে এতে নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক তথ্য বা নির্দেশনার আকারে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপক উপাত্ত (data) রয়েছে। তাঁর মতে এসব বৈজ্ঞানিক উপাত্ত কাজে লাগানোর জন্য কোরআন একটি নমনীয় ও সার্বিক পদ্ধতি (বিধি) পেশ করেছে-যে পদ্ধতি স্থান ও কালের পরিবর্তনের শিকার হবে না এবং প্রত্যেক যুগ ও পরিবেশ কার্যকর থাকবে।

কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নতুনভাবে অধ্যয়নের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিকোন থেকে পরামর্শ দোয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে দু'জন খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদ ডঃ আল আলওয়ানী এবং ডঃ খলিল ইসলামী কাঠামোর আওতায় এসব উৎসের প্রতি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের মতামত পেশ করেছেন।

ডঃ এ এস আল শেইখ আলী
রশিদ মাসাউদী

কোরআন ঃ জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস

ডঃ তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী

সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম হচ্ছে সকল সৃষ্ট জীবের জন্য ক্ষমা, আলো, নির্দেশনা ও ধন্বন্তরী।

> "আমরা তোমাকে সকল সৃষ্ট জীবের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি" (কোরআন-২১ঃ১০৭)

এই বাণী ও তার গ্রন্থ কোরআন সর্বদা মানবতাকে নির্দেশনা দিয়ে যাবে এবং সবরকম বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে অটুট থাকবে। মহান আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)[১] বলেছেন,

> বাতিল না সামনের দিকে হতে না পিছন হতে একে মোকাবেলা করতে পারে। এটা এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রশংসিত সত্তার নাযিল করা জিনিস (৪১ ঃ ৪২)।

পবিত্র কোরআন হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব এবং সর্বশেষ নবী (নবীদের মোহর) হযরত মুহাম্মদ (দঃ)[২] এর মাধ্যমে এটা মানব জাতির প্রতি নাযিল হয় হেদায়াত হিসেবে। বস্তুতপক্ষে মুহাম্মাদ (দঃ) এর পরে আর কোন নবী নেই এবং কোরআনের পরে আর কোন অহী আসবে না।

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নবীদের প্রেরণ করা হতো। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায়, তাদের উপযোগী করে নবী রাসূল প্রেরিত হতেন। নিঃসন্দেহে মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সর্বাধিক লক্ষ্য রেখে নবীরা সাড়া দিয়েছেন।

> অতীতে এমন কোন গোত্র বা জাতি ছিল না যাদের প্রতি নবী বা প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ হয়নি (৩৫ঃ২৪)।
>
> আমরা যেখানেই কোন রসূল পাঠিয়েছি সে নিজ জাতির জনগণের ভাষাতেই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন সে খুব ভালভাবে কথা বুঝিয়ে বলতে পারে (১৪ঃ৪)।

ইতিপূর্বেকার নবীদের মিশনে ঐশী চিহ্ন এবং শারীরিক মু'জিজা দেখানো হতো। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে আল্লাহর কালাম মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নবী তার লোকদেরকে ছায়াদানের জন্য তাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করতেন, সাগর বিভক্ত

করে দুই জলরাশির মধ্যে শুকনো রাস্তা দিয়ে তার গোষ্ঠী চলে যেতো, হাতের ছড়ি নিক্ষেপ করলে তা সাপে রূপান্তরিত হতো কিংবা পকেটে হাত ঢুকিয়ে তা পুনরায় বের করে আনলে তা চকমক করতো, তবে কোন ক্ষতি হতো না। আরেক নবীকে এক বিস্ময়কর উষ্ট্রী দেওয়া হয়েছিল প্রতীক ও নিদর্শন হিসেবে। তৃতীয় এক নবী মৃতকে জীবিত করতে এবং অন্ধ ও কুষ্ঠদের নিরাময় করতে পারতেন। এসব চিহ্ন ও মু'জিজা দেখার পরও জনগণ নবীর প্রতি ঈমান না আনলে শাস্তি ও ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেয়া হতো। তবে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন।

মক্কার কাফেরগণ যখন মহানবী (দঃ) কে তাদের জন্য ঝর্ণাধারা থেকে সবেগে পানি প্রবাহিত করার, আকাশে মই লাগিয়ে তাতে আরোহণ করার অথবা স্বর্ণমন্ডিত একটি বাড়ীর অধিকারী হওয়ার দাবী জানাল আল্লাহ তাদের দাবীর প্রতি সাড়া দেন নি। নবী কিভাবে মানুষ হয়, এটাও তাদের প্রশ্ন ছিল।

> এবং তারা বলে, এ কেমন রসূল যে খাবার খায় ও হাঁটে বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন পাঠানো হলো না যে তার সঙ্গে থাকতো এবং (অমান্যকারী লোকদের) ভয় দেখাতো। অথবা অন্ততঃ তার জন্য কোন ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হতো' কিংবা তার নিকট কোন বাগান হতো যা থেকে সে রুজী লাভ করতো। আর এই জালেমরা বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলতে শুরু করেছ (২৫ঃ৭-৮)
>
> আমরা এই কোরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকৃতিতেই দৃঢ় হয়ে থাকলো। (১৭ঃ৮৯)।

তারা বললো ঃ আমরা তোমার কথা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য জমীনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে না দেবে। কিংবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের জন্য একটি বাগান রচিত না হবে আর তুমি এতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে না দিবে। অথবা তুমি আকাশমন্ডলকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলে দিবে, যেমন তুমি দাবী করছো। কিংবা খোদা ও ফেরেশতাগণকে সামনাসামনি আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্য স্বর্নের একখানি ঘর নির্মিত হবে কিংবা তুমি আসমানে আরোহন করবে। আর তোমার এই আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষন তুমি

আমাদের উপর এমন একখানি লিপি অবতরণ না করবে যা আমরা পড়ব। হে মুহাম্মাদ! বলো, পাক ও পবিত্র আমার খোদা। আমি একজন পয়গামবাহক মানুষ ছাড়া আরও কি কিছু?

> লোকদের সামনে যখনই হেদায়াত এসেছে তখনই তার প্রতি ঈমান আনা হতে তাদেরকে কোন জিনিস বিরতি রাখে নি। বিরত রেখেছে শুধু তাদের এই কথাটি যে, আল্লাহ কি (আমাদের মতো একবলে) মানুষকে নবী রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। (১৭ঃ৮৯-৯৪)

> একই সূরায় কাফেরদের দাবীর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ আগের লোকেরা মিথ্যা মনে করে অমান্য করায় আমরা নিদর্শন পাঠাতে বিরত থেকেছি। আমরা চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সম্পদ-এর প্রতি উষ্ট্রী এনে দিয়েছি। আমরা চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সম্পদ-এর প্রতি উষ্ট্রী এনে দিয়েছি। আর তারা তার ওপর জুলুম করলো। আমরা নিদর্শন তো এ জন্য পাঠাই যে, লোকেরা উহা দেখে ভয় করবে (১৭ঃ৫৯)।

আল্লাহ তায়ালা অবশ্য হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, সুস্পষ্ট চিহ্ন ও মু'জিজার অভাবেই কাফেরগণ আল্লাহর বাণী প্রত্যাখান করে নি, তার অন্যান্য কারণও রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ)[৩] এর মাধ্যমে মিসরের ফেরাউন এবং জনগণকে সন্দেহাতীত চিহ্ন ও মু'জিজা দেখানো হয়েছিল, তবুও তারা জনগণকে সন্দেহ আর মক্কার কাফেরদের অনুরূপই প্রতিক্রিয়া দেখছিল।

> আমরা মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছিলাম। এখন তোমরা স্বয়ং বনী ইসরালের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বললঃ হে মুসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগ্রস্ত (১৭ ঃ ১০১)।

> আর আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ কে (দঃ) বললেন যে, এই অহীর জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী অথবা কোরআন ছাড়া অপর কোন নিদর্শন বা গ্রন্থের প্রয়োজন নেই এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি যেন তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শণকারী পাঠাতে পারতাম। অতএব আপনি কাফেরদের কথা কখনও

মানবেন না এবং এই কোরআন নিয়ে তাদের সাথে বড় জিহাদ করুন (২৫ ঃ ৫০-৫২)

এই সর্বশেষ অহীর মাধ্যমে কোরআন অধ্যয়ন, শ্রবণ ও অনুধাবন করে আল্লাহর বাণীর প্রতি ঈমান আনার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। যারা আগ্রহের সাথে সত্যের বাণী শুনতে এবং তা প্রত্যক্ষ করতে চায় তাদের মন-মানস ও হৃদয়ের কাংখিত পরিবর্তনের জন্য এটাই যথেষ্ট। তবে যাদের দিলে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের উগ্রতা ও প্রগল্‌ভতা আগের মতই রয়ে যায়।

তথাপি এই লোকেরা বলে, এই ব্যক্তির উপর তার খোদার তরফ হতে নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন? বল, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর নিকট রয়েছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভয় প্রদর্শণকারী ও সাবধানকারী। এই লোকদের জন্য এটা (এই নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা এই লোকদের পড়ে শুনানো হয়? প্রকৃত পক্ষে এতে রয়েছে রহমত ও নসিহত সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে (২৯ ঃ ৫০-৫১)।

এই উম্মাহর জীবনে আল্লাহ তায়ালা পড়াকে মূল বিষয় বানিয়েছেন। হযরত জিবরাইল ফেরেশতা কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাযিলকৃত প্রথম শব্দ হচ্ছে ইকরা (পড়)। এর জবাবে নিরক্ষর নবী বললেন, আমি পড়তে পারি না। এরপর ফেরেশতা তাঁকে আল্লাহর আদেশে (বাণী) শোনালেন ঃ

পড় (হে নবী)! তোমার খোদার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাটবাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না (৯৬ ঃ ১-৫)

যে প্রক্রিয়ায় নবী করিম (সঃ) অহী পেতেন, তার শুরুর এই আয়াতগুলিতে[৪] দুটি নির্দেশ রয়েছে। এবং এর প্রত্যেকটিতে একটি ঐশী ও একটি মানবিক দিক রয়েছে।

প্রথম নির্দেশ হচ্ছে পড়তে। অর্থাৎ নাযিলকৃত অহী গ্রহণ, অনুধাবন ও ঘোষণা করতে। কোরআন যে আল্লাহর কালাম ও অহী এবং তিনিই তার নবীর কাছে এটা নাযিল করেছেন যাতে করে তা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যভাবে পৌঁছে দেয়া যায়-এই নির্দেশের মধ্যে ঐশী দিকের প্রতিফলন

ঘটেছে। আর মানুষের কাজ হচ্ছে এটা ভেবে দেখা, স্মরণ করা, অনুধাবন করা ও অব্যাহতভাবে শিক্ষা করা।

> কোরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার অহী পরিপূর্ণতায় পৌছে যায়। আর বল, হে খোদা! আমাকে অধিক ইল্‌ম দান কর (২০ ঃ ১১৪)।

> আমরা এই কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেহ আছে কি? (৫৪ ঃ ১৭)

> "হে নবী! এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবে না। এটা মুখস্ত করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব (৭৫ ঃ ১৬-১৭)।

সুতরাং আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে নাযিল করা, প্রেরণ করা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, মানুষের কাজ হচ্ছে পড়া, শিক্ষা করা এবং শিক্ষাদান করা যাতে রুহ পরিশুদ্ধ ও পরিস্কার হতে পারে। এরপর তারা খলিফা হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের এবং সভ্যতার নির্মাণে এবং মানব জাতির মধ্যে উত্তম মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কাজে লাগাতে পারে ঃ

এতো তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রসূল স্বয়ং তাদের মধ্য হতে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তার আয়াত শুনান (৬২ ঃ ২)।

অধ্যয়নের দ্বিতীয় প্রত্যাদেশে মানব সমাজকে বিশ্বজাহান পর্যবেক্ষণ এবং তার বিবিধ উপাদান ও উপকরণের অর্থ অনুধাবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সবই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং এ গুলিতে তার তাওহিদের প্রকাশ সুস্পষ্ট। আসলে মানুষের খোদ সৃষ্টিসহ সৃষ্টিতে ঐশী প্রাধান্য সুস্পষ্ট। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু জমাটবাঁধা রক্ত থেকে (৯৬ঃ২)। জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানুষ এবং জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক এবং এ পর্যায়গুলো এই সুশৃংঙ্খল বিশ্বজাহানে ক্রিয়াশীল ঐশী শক্তির অন্যান্য চিহ্নের সাথে মিলে যায়। এর উদ্দেশ্য হচেহ মানুষকে জ্ঞানার্জনে এবং সভ্যতা বিকাশের উপযোগী করে তৈরী করা। এটা আল্লাহর রহমতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সকলের কণ্ঠ ও ভাষায় তাঁর গৌরব গাঁথা বিঘোষিত। "পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যা তার প্রশংসা করে না" (১৭ঃ৪৪)। অপর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে অস্তিত্ব এবং সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্য অনুধাবন।

> তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে বসবাস করতে দিয়েছেন। (১১ ঃ ৬১)
>
> আমি মানুষ এবং জ্বীনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি (৫১ ঃ ৫৬)।

এই দুটি পাঠ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একই সাথে ঘটে থাকে এবং তা হয়ে থাকে আল্লাহর নামে। তদুপরি তাদের আন্তঃসম্পর্ক আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি করে এবং নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেয় খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে এবং মহাবিচারকালে তিনি তার সহযোগী হন। "এবং তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন (৫৭ ঃ ৪)। আল্লাহ মানুষের প্রতি এতই রহম দিল যে, তিনি এই দুই অবস্থাতে কোনটিতেই মানুষকে একা ছেড়ে দেন না। বরঞ্চ এই আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, তিনিই মানুষকে পরিচালিত করেন ঃ

> "পড় এবং তোমার প্রভুই হচ্ছে অতি দানশীল"। তিনি তোমাদেরকে কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানতো না তা শিক্ষা দিয়েছেন (৯৬ ঃ ৩-৫)।
>
> তিনি জানেন মানুষের দুর্বলতা, তার সামর্থের সীমাবদ্ধতা, তার জ্ঞানের এবং চিন্তার আপেক্ষিক স্বল্পতা।
>
> তিনি যে সৃষ্টি করেছেন তা কি তিনি জানেন না? তিনি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম রহস্যসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল এবং তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভালভাবেই অবগত (৬৭ ঃ ১৪)।
>
> মানুষকে দুর্বল প্রকৃতির হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে (৪ ঃ ২৮)। আর জ্ঞানের অত্যন্ত সামান্য অংশই তোমাদের দেয়া হয়েছে (হে মানুষ) (১৭ ঃ ৮৫)।

আল্লাহ এভাবে আদমকে (আঃ) সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন কলমের মাধ্যমে এবং মানুষ যা জানতো না তাও শিক্ষা দিলেন। উদ্দেশ্য মানুষের প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ করা এবং তিনি প্রতিটি জিনিসই তার অনুগত করে দিলেন, তাকে বিশ্বময় ভ্রমণের আদেশ দিলেন এবং পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকগুলো খুলে দিলেন। সে যাতে দ্বিতীয় পাঠ নিতে পারে তার চিহ্নও বলে দিলেন। এই দুই পাঠের সম্মিলন হচ্ছে বিশ্ব এবং পরজগতের কল্যাণের পূর্বশর্ত। এই দুই পাঠের যে কোন একটির পরিত্যাগ অথবা অবহেলা প্রদর্শন অথবা তাদের মধ্যকার ভারসাম্যহীনতা

ঘটানোর অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কালাম থেকে দূরে চলে যাওয়া। এ ধরনের কার্যকারণের দুঃখজনক পরিণতি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনকে সংকটময় করে তোলা এবং পরকালের জীবনকেও মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা।

"যারাই আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের জীবন হবে সংকীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব (২০ ঃ ১২৪)।

এ অবস্থায় মানুষ খলিফা এবং সাক্ষীদাতা হিসেবে তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবে এবং অপমান ও দাসত্বের জীবন বরণ করে নেবে।

> যারা খোদাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা স্ফূর্তি করবে (এই দুনিয়াতে) এবং গবাদিপশুর মত খাবে। আর দোযখ হবে তাদের বাসস্থান (৪৭ ঃ ১২)।
>
> তারা গবাদি পশুর মত-বরং আরো বেশী বিভ্রান্ত; কারণ তারা (হুশিয়ারী থেকে) একেবারেই বেপরোয়া (৭ ঃ ১৭৯)

দ্বিতীয় পাঠের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়ে প্রথম পাঠের সাথে অতিরিক্ত সংশ্লিষ্টতার ফলে পাঠক অনেকগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকারী হতে পারে যা তার ধারণা ও চেতনার প্রতি অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। একই সাথে এটা তাকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক স্থবিরতায় নিয়ে যেতে পারে এবং খলিফা ও সভ্যতার ধারক হিসেবে তার প্রয়োজন এবং দায়িত্বের সাথে অসম্পৃক্ত বিষয়ে আত্মলীন হতে পারে। এটা সীমিত পরিমাণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেনে নেয়া যেতে পারে বা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে তবে উম্মাহর বিস্তৃত পর্যায়ে যদি এটা ঘটে অথবা তার জীবন বিধানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এর ফলে মানবিক মূল্যবোধের ধারণা অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে। পরিণামে কোন ব্যক্তি জীবন দর্শনের এবং বিশ্বে তার অস্তিত্বের জন্য মানুষ হিসেবে যে ভূমিকা, তার প্রতি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। এটা তখন এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্বকেই বোঝা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং কেয়ামতের সাফল্যের প্রত্যাশায় চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার চেষ্টা করবে।

কোরআনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কোরআন ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। নাযিলের সময় জনগণের হৃদয় ও মন-মানস যাতে তা গ্রহণ, অনুধাবন এবং চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। সে জন্য বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপলক্ষে এটা নাযিল হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণ তা বুঝতে পারত এবং তাদের হৃদয়-মনে কোরআনের শব্দ, অর্থ, আদেশ ও নির্দেশ স্থায়ীভাবে গেঁথে নিত। এরপর তাদের হৃদয় তা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হতো, তাদের মন-মানস এগুলো অনুধাবন করত এবং তাদের মানসিকতা হতো উন্নত। সামগ্রিক জীবন এতে সাড়া দিত এবং তা সন্তুষ্টি এবং পবিত্রতার জীবনে রূপান্তরিত হতো।

> পবিত্র কোরআন এভাবে প্রথম যুগ এবং পরবর্তী যুগের জন্য একটি দিক নির্দেশনা, একটি প্রমাণ ও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে পারে।
>
> তারা বলে, এই ব্যক্তির উপর সমস্ত কোরআন একই সময়ে নাযিল হয় না কেন?-হ্যাঁ, এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, আমরা উহাকে খুব ভালভাবে মনমগজে বদ্ধমূল করছিলাম আর (এই উদ্দেশ্যেই) আমরা উহাকে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি (২৫ ঃ ৩২)।
>
> আর এই কোরআন আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি- যেন তুমি থেকে থেকে তা লোকদের শুনাও আর একে আমরা ক্রমশঃ নাযিল করেছি (১৭ ঃ ১০৬)।

পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে একটি চ্যালেঞ্জ ও মু'জিজা হিসেবে যা মানুষের হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করত, ফলে তার আত্মা হতো আলোকিত। এভাবে খোদার বাণী গ্রহণ করার পথ হতো উন্মুক্ত এবং তারা দেহ-মন উজাড় করে দিয়ে তা গ্রহণ করতো।

পবিত্র কোরআনে প্রত্যেক স্থান ও কালের এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল মানুষের উপযোগী মৌলিক ধারণা, সাধারণ বিধি, নির্দেশনা এবং উপদেশ রয়েছে। যদি নাযিল হওয়ার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট-খাট ঘটনা ও সমস্যা নিয়ে এতে আলোচনা করা হতো তাহলে সময় ও কালের সার্বজনীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্য তার থাকত না এবং পরবর্তী যুগের মানুষ তাতে দেখতে পেতো ব্যাপক অসংগতি ও অসামঞ্জস্যতা। যেসব বিশেষ সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে সেগুলো প্রত্যেক কালের পরিস্থিতির সাথে অনিবার্যভাবে একই প্রকৃতির

ও বিধির এবং পূর্ববর্তী গোষ্ঠী ও মানুষের ইবাদত, উত্তরাধিকার ও ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদা করে বলেছেন,

> আমরা নিঃসন্দেহে কোরআন নাযিল করেছি এবং আমরা নিশ্চিতই তা (বিকৃতি থেকে) রক্ষা করব (১৫ ঃ ৯)।

কোরআনকে তার মূল ভাষায় সংরক্ষণের পেছনে উদ্দেশ্য (এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুসারে একে আরবীতে প্রচারের নিষেধ) ছিল এটা নিশ্চিত করা যে আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য যেরূপ জীবন পদ্ধতি পছন্দ করেছেন তা প্রতিষ্ঠা করতে যেন এ গ্রন্থটি (সর্বকালে) সক্ষম থাকে। কোটি কোটি মুসলমান পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ারকালে যেসব শব্দে ও আকারে ছিল-সেভাবেই পড়ছে ও আবৃত্তি করছে। এর ফলে মুসলমানদের মত ও পথ যত রকমের হোক না কেন সকল কালের এবং সকল দেশের মুসলমানরা কোরআনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয় এটা আল্লাহর এক বিস্ময়কর কুদরত। এজন্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এবং তাঁর সাহাবী ও নেতৃস্থানীয় ফকিহ্গণ[4] দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর মানুষের মননে প্রথমে গেঁথে রাখতে হবে, এরপর লিখে রাখা হবে। একই ধারা মহানবীর (দঃ) সাহাবীদের পক্ষ হতে অনুসরণ করা হয়েছে বলে তাবেঈনরা (যারা সাহাবীদের দেখেছেন) জানিয়েছেন। সাহাবীরা পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু লিখে রাখা নিষিদ্ধ মনে করতেন। অন্যান্য বিষয় বাস্তব প্রয়োগ সংক্রান্ত এবং তা ছিল তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে। ধর্মীয় অথবা অন্য কোন মূল গ্রন্থের বেলায় এ ধরনের অবস্থা কখনো ঘটেনি।

কোরআনের অর্থ সম্পর্কে বলা যায়, মহানবী (দঃ) প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান রাখতেন। তবে তিনি তা করতেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নবী হযরত জিবরাইলের (আঃ) মারফত শিক্ষা পেয়ে অল্প কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এসব আয়াত গায়েব (অদৃশ্য) সম্পর্কিত এবং এমন আরো কিছু বিষয় যা শুধু অহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব। ফলে কোরআনের তাফসীর ক্রমশ ঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা নানা পথে কোরআন চষে বেড়িয়েছেন। এদের কেউ সফল হয়েছেন, কেউ হন নি। মহানবীর (দঃ) সাহাবীরা অহী নাযিল হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নাযিল হওয়ার কারণ, নাসিখ এবং মানসুখ[5] আয়াত এবং এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত কারণ জানতেন। ঈমাম গাজ্জালী (রহঃ) এবং ঈমাম কারতবী (রহঃ) বলেছেন,

সাহাবীরা তাফসীর সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন তা সবই রসূলে করীম (দঃ) থেকে এসেছে-এ কথা মনে করা দু'টো কারণে ভুল। এর একটা হচ্ছে মুহাম্মাদ (দঃ) অল্পসংখ্যক আয়াতেরই তাফসীর করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এরূপ মত পোষণ করেন। অপর কারণটি হচ্ছে তারা স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের তাফসীরে ভিন্ন মত পোষণ করেছে যার সমন্বয় সাধন করা হয় নি এবং মহানবী (দঃ) থেকে যার সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি, যদিও অনেকেই এরূপ করে থাকতে পারেন[৭]।

সীমিত পরিমাণে কোরআন শরীফ অনুধাবনের ফলে মেধা বা মননের ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তার ফলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা কোন ক্ষেত্রে বা বংশের জন্য এর অর্থ বন্দী হয়ে পড়ে।

মূলতঃ কোন মুসলমানের পক্ষে খোদার নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর দিক হচ্ছে কোরআন অধ্যয়ন এবং সাথে সাথে তার আয়াত ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। এর বিপরীতক্রমে অনুধাবন ছাড়া পাঠ বা অধ্যয়ন সমর্থনযোগ্য নয়। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, অনুধাবন ও অনুধ্যান সহকারে অল্প পরিমাণ পড়া ও চিন্তা-ভাবনা করা অনুধ্যান ছাড়া বেশী পড়ার চাইতে উত্তম। এখানে অনুধ্যান বলতে আমরা বুঝি আয়াতের আবৃত্তি করা, পর্যালোচনা করা, এর অন্তর্নিহিত সকল অর্থ জানার লক্ষ্যে আলোচ্য অংশের বিশদ আলোচনা করা এবং মেধাবী ও বুদ্ধিবৃত্তির মননশীল লোকদের জন্য আল্লাহ্ যে অন্তর্নিহিত অর্থ সাজিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে অবাধ ও অব্যাহত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দান।

ঐশী গ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কোরআন হচ্ছে সর্বপ্রকার জ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞানের পন্ডিতদের জন্য একটি প্রামাণ্য নির্দেশিকা। এতে সাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং নির্দেশনা রয়েছে যা মানুষের বৈজ্ঞানিক স্পৃহাকে জাগ্রত এবং পরিচালিত করে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে বহু মুসলমান দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণা পোষণ করে আসছেন যে, পবিত্র কোরআন হচ্ছে মূলতঃ বিভিন্ন জাতির অতীত ইতিহাসের একটি সূত্র। এর কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে হুশিয়ারী বাণী হিসেবে, এছাড়া কেয়ামত এবং অদৃশ্য বিষয় ও ফিকাহ্র[৮] খুঁটিনাটি বিধি-বিধান সম্পর্কে একটা তথ্যের ভান্ডার।

তারা এর কবিত্বপূর্ণ ভাষা, ষ্টাইল (style) এবং আরবী ভাষায় ওজস্বিনী ছন্দ ও ভাষাগত সৌকর্যের অনুকরণীয় দিকের যাদুকরী সৃজনশীলতার ব্যাপারেই

বেশী দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। তাছাড়া আরবী ভাষার আওতায় থেকে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত আরবী ষ্টাইলের মোহনীয় শক্তিশালী রচনাশৈলীর উপরও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিককালে পন্ডিতরা পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর গুণাগুণের সমীক্ষায় প্রায় এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখতেন। আল রুমানি, আলবাকিল্লানি, আলমুরযানি ও কাজী আয়াজ এবং অন্যান্য পন্ডিতদের গ্রন্থরাজিতে তা দেখা যায়, পবিত্র কোরআনকে ফিকাহ্ এবং আইনের উৎস হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে, যা কোরআনের দুইশ থেকে পাঁচশ আয়াতের মধ্যে সীমিত। বাকী আয়াতগুলি মৃদু তিরস্কার ও হুশিয়ারী এবং মানসিক উন্নতি সাধনের একমাত্র লক্ষ্যেই প্রেরিত হয়েছে। তবে এ ধরনের বিধি-নিষেধ কোরআনের মু'জিজাকে ভাষার অলংকরণে সীমাবদ্ধ করা ছাড়াও যেসব বিষয় নবায়নযোগ্য এবং যে কোন স্থান ও কালে প্রয়োগযোগ্য এবং যা কোরআনের বিস্ময়কর প্রকৃতির সাক্ষীস্বরূপ এসব বিষয়ে খুঁজে বের করার ব্যাপারে উৎসাহ হ্রাস করে দেয়।

আমরা যেহেতু ইসলামী রেনেসাঁর লক্ষ্যে একটি চমৎকার সমকালীন ইসলামী জীবন ধারা রচনা করতে চাই সে জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, ফিকাহ্ সম্পর্কিত বিধান পবিত্র কোরআনের ব্যাপক আওতার খুব সামান্য অংশই মাত্র জুড়ে আছে। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআনের সকল আয়াত অনুধাবন এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য মুসলমানদেরকে তাদের মেধা কাজে লাগাতে হবে। মানুষের ফিতরাতের (স্বভাব প্রকৃতি) ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও ফলিত বিজ্ঞানের সকল জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস ও ভিত্তি হিসেবে কোরআনকে বেছে নিতে হবে। বস্তুতঃ জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রত্যেক মুসলমানকে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার জন্য কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। খোদায়ী গ্রন্থের সচেতন এবং চিন্তাশীল অধ্যায়ন তার জ্ঞানের ভান্ডারকে সংশোধন, পরিবর্ধন এবং পুনর্বিন্যাস করতে সাহায্য করবে। এর ফলে মুসলমানরা কোরআনের সত্যিকার উম্মাহ গড়ে তুলতে পারবে। তবে এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে বেশ কিছু বিষয় অর্জন করতে হবে ঃ

পবিত্র কোরআনের মু'জিজার বিষয় সংক্রান্ত অধ্যয়নের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে মু'জিজার বিষয় সংক্রান্ত অধ্যয়নের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে মু'জিজা হিসেবে বর্ণিত কোরআনের এসব বিষয়ে আধুনিক মুসলমানরা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে কি কি যোগ করতে পারে তা চিন্তা করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ গবেষণার বিষয়ের মধ্যে মানুষের ফিতরাতের ওপর কোরআনের প্রভাব, যেকোন স্থান বা কালের

সর্বোত্তম মানুষ এবং সর্বোত্তম পরিবার গড়ে তোলায় তার সামর্থ এবং সমাজ ও জাতি গঠনে তার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মুসলিম মনস্তত্ত্ববিদগণ ও সমাজতত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে আগ্রহের সাথে গবেষণা করতে পারেন। একইভাবে মুসলিম ফলিত বিজ্ঞানী এবং পন্ডিতরা কোরআনে মূল্যবান উপকরণ খুঁজে পেতে পারেন। মুসলিম চিন্তাবিদ এবং আলেমগণ সুন্দর মানব জীবন এবং ন্যায়সঙ্গত, সহজে অনুধাবনে সক্ষম ও বাস্তবে প্রযোজ্য একটি পদ্ধতির দৃঢ়ভিত্তি রচনায় সমর্থ আহ্‌কামের ক্ষেত্রে তাঁর মু'জিজার বিষয়ে গবেষণা করতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পবিত্র কোরআন পাঠ এবং তফসীরের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনঃর্বিবেচনা করতে হবে। দেশ এবং জাতিসমূহের অতীত, কিয়ামত এবং ফিকাহের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তিনটি উদ্দেশ্যের বাইরে যেতে হবে। এছাড়া আরও অপরিহার্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঃ

১. মানুষের জীবনাচরণ এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক আচরণ ও ফিত্‌রাত সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশনা লাভ।

২. সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে মৌলিক বিধি ও নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, মানবিক এবং সমাজ প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে এই জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং এই লক্ষ্য কিভাবে অর্জিত হবে সে সম্পর্কে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা নিম্নোক্ত দু'টি উদ্দেশ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল শাখাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি। এভাবে পবিত্র কোরআন সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ও পন্ডিতের কাছে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স এবং নৈতিক মাপকাঠিতে পরিণত হয়, যে রেফারেন্সের বিষয়বস্তু কখনো সেকেলে হবে না। সামাজিক ও ফলিত এবং সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা প্রাত্যহিক পরামর্শের জন্য এখানে মূল্যবান উৎস খুঁজে পাবেন। এর অর্থ হচ্ছে একজন মুসলমান বর্তমানে পবিত্র কোরআনকে যেভাবে দেখছে তা থেকে ভিন্নরূপে দেখতে হবে; বর্তমানে তারা আল্লাহর রহমত লাভের আশায় অথবা বিশেষ বিশেষ বিধান জানার উদ্দেশ্যে কোরআন পড়ে থাকে। এক্ষেত্রে দু'ধরনের তাফসীর সম্পর্কে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করতে হবেঃ আল তাফসীর বাই আল মা'সুর (মহানবী এবং সাহাবীদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ব্যাখ্যা করা) এবং আল তাফসীর বাই আল রা'ই (স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা) এই বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে কারণ এখনকার আলেম ও পন্ডিতগণ তাঁদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে মহানবী (দঃ)

ও সাহাবীদের জীবনধারা সম্পর্কে সবসময় খোঁজ রাখতে পারেন না। সুতরাং তাদের বক্তব্যে ব্যক্তিগত মতামতের প্রাধান্য থাকবে বেশী। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, হাদীসের গ্রন্থরাজি বিদ্যামান থাকার প্রেক্ষাপটে আল তাফ্সীর বাই আল রাই এর পক্ষে কিভাবে কাজ করা যাবে? হাদীসে[৯] ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কোরআন ব্যাখ্যা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মহানবীর (দঃ) অনেক সাহাবী, তাবেঈন সুন্নাহর সমর্থন ছাড়া কোন প্রকার ব্যাখ্যা দানে বিরত থাকতেন। তাহলে আমরা কি এখন যেকোন বিষয়ে খাঁটি মুসলিম গবেষক প্রত্যাশা করতে পারি না? যিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে তাঁর যুক্তি প্রয়োগ করবেন? অবশ্য এটা একটা বড় এবং নাজুক প্রশ্ন। এর উত্তর স্পষ্ট হয়ে আসবে নিচের আলোচনা লক্ষ্য করলে।

আমরা বলেছি মহানবী (দঃ) থেকে আল তাফসীর বাই আল মা'সুর এর সীমিতসংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। সুতরাং যুক্তির দাবী এই যে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরকে কোরআনের আয়াত অনুধাবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা, অনুধ্যান এবং যুক্তির সাহায্য গ্রহণের অনুমতি দিতে হবেঃ

যুগ যুগ ধরে তাফ্সীরের বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাফ্সীরকারকগণ পবিত্র কোরআনের বিধান ও অন্যান্য বিষয়ের অর্থ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বহুমুখী দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেছেন। ঈমাম ফখরুদ্দিন আল রাজি (অফাত ৬০৬ হিজরী) বলেছেন, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যায় একটি উট বোঝাই করার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি লিখতে পারতেন। কার্যত এই সূরা সংক্রান্ত তার তাফ্সীর লিখিত হয়েছে এক বিরাট গ্রন্থে। ইবনুল আতিয়্যাহ, আল কুর্তুবী, ইবনুল সাববাগের ন্যায় বহু আলেম একটি আয়াতের লব্ধ অর্থ থেকে শত শত বিষয় উথ্থাপন করতেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এ প্রসংগে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতো এবং মহাজাগতিক আইন, সভ্যতার ধরন পভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলতো। এসবের দরুন আল কোরআন অবতীর্ণ অন্যান্য আসমানী কিতাবের মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । অবশ্য এসব ব্যাপারে আগে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি বা রাসূলে করিম (দঃ) এর ব্যাখ্যাও দেননি। এখন পর্যন্ত অন্যান্য উলেমা ও পন্ডিতগণ তাফ্সীর করার সঠিক শর্তাবলী পূরণ না করা পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করে দেননি। তাইয়্যেবীর ভাষায় এসব শর্তাধীনে তাফ্সীর হতে হবে(মূলগ্রন্থের) প্রকৃত বাক্যের শর্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কৃত্রিমতা,অস্বাভাবিক আচরণ, বাগাড়ম্বর ও বাহুলতামুক্ত[১০]।

সুতরাং কোরআনের তাফ্সীরে ব্যক্তিগত অভিমতের ব্যাখ্যা যে, অর্থে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে তা নিম্নোক্ত শ্রেণীতে পড়েঃ

১) আরবী ভাষা, তার ষ্টাইল শরীয়তের উদ্দেশ্যে নসিখ ও মনসুখ আয়াতের প্রশ্নে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি ছাড়া এবং বিশেষ আয়াতের শানে নযুলের প্রতি মনোনিবেশ না করে ব্যক্তিগত মতামতের সাহায্যে তাফ্সীরকরা। এই ধরনের নৈমিত্তিক তাফ্সীর হচেছ পুরোপুরি অনুমান সর্বস্ব এবং সত্যের অগ্রগতিতে কোন অবদান রাখে না।

২) চিন্তা-ভাবনা ও অনুধ্যানের ভিত্তিতে তাফ্সীর করা তবে এসব তাফ্সীরকারক আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ব্যাপারে সমন্বিত দৃষ্টি দিতে না পারার কারণে এই তাফ্সীর ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাফ্সীরকারক আয়াত অথবা এই বিষয়ের যে কোন অর্থের বাহ্যিক অর্থ ধরে নিয়ে উপসংহার টানেন এবং ধরে নেন যে, শুধু এই অর্থেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

৩) সর্বশেষ শ্রেণীই হচ্ছে তাফ্সীরকারক যদি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর চিন্তার বা মতের সমর্থক হয়ে থাকেন যার ফলে তিনি ভাষাশৈলীর অর্থ এবং আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি লক্ষ্য না করে তার নিজস্ব মতামতের স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা দিতে চান। উদাহরণস্বরূপ বায়ানীয়াহ গোষ্ঠীর কথা বলা যায়। তারা তাদের নেতা বায়ান বিন শামান আল তামিমী প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াত হচ্ছে মানুষের প্রতি একটি বয়ান (একটি সোজাসুজি বিবৃতি) (৩ঃ১৩৮)। কাদিয়ানীরা সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের যে আমার পরে আসবে এবং যার নাম হবে আহমদ (৬১ঃ৬)" এই আয়াতের আহমদ অর্থ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিসেবে দাবী করেছে। বাতেনীরা দাবী করেন যে, কোরআনের একটি জাহেরী ও একটি বাতেনী অর্থ রয়েছে। জাহেরী অর্থ মুসলমানরাই অনুধাবন করে থাকেন। অপরদিকে বাতেনী অর্থকে তারা কাজে লাগান অতীত দর্শন, প্রাচীন, ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা তাদের বিভিন্ন নেতার বিভ্রান্তিকর মতের সমর্থনে সংগৃহীত কুসংস্কারের পক্ষে। কেউ যাতে তাদের যুক্তি খন্ডন করতে না পারে সে জন্যে তারা উম্মাহার নেতৃস্থানীয় পন্ডিতবর্গ এই ধারণা খন্ডন করতে এবং এর উদ্দেশ্য তুলে ধরতে পারেনি।

এপর এক ধরনের চিহ্ন যা বর্তমানে প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে তার কথা এসে যায় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি আয়াতের প্রতীকী অর্থ রয়েছে যাতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা তাৎক্ষনিকভাবে চেতনায় ধরা পড়েনা এবং ঐ ভাষাতেও যার অর্থ প্রতিফলিত নেই। এখানে দেখুন,

যে ব্যক্তি খোদার মসজিদসমূহে খোদার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা চালায়, তার চেয়ে জালেম আর কে হবে

(২ঃ১১৪) এখানে কেউ কেউ দাবী করতে পারে যে, মসজিদের অর্থ হচ্ছে হৃদয় কেননা আল্লার সাথে মানুষের সম্পর্ক হৃদয়ের। এ ধরনের ব্যাখ্যা ভাষাগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তবে তিন পদ্ধতির তাফ্সীর গ্রহনযোগ্য হতে পারেঃ

প্রথমতঃ শব্দের সুস্পষ্ট অর্থের অনুধাবনের মধ্যে সীমিত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। সতর্ক চিন্তা-ভাবনার পর বিজ্ঞ তাফ্সীরকারকগণ এধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং এর ভিত্তি হবে প্রচলিত বাকধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষাগত প্রেক্ষিতে এবং তা পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিরোধী হবে না।

তৃতীয়তঃ তাফ্সীরকারক তার নিজস্বকালের বুদ্ধিবৃত্তিক , বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সঙ্গীদের ব্যবহার করে আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখতে চায় পবিত্র কোরআনের নির্দেশনার সাথে তা কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর পর তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আয়াতের নির্দেশিত অর্থের আলোকে কিভাবে তিনি এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করবেন।

> তিনি যাকে চান সুবুদ্ধি দান করেন, আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করলো, প্রকৃতপক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করলো। এসব কথা হতে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে যারা বুদ্ধিমান (২ঃ২৬৯)

আধুনিক মুসলিম অর্থনীতিবিদ যখন আল্লাহর এই আয়াত পড়ে. "ধনসম্পদ যেন তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত না হয়(৫৭ঃ৭)" এবং ধনসম্পদ অর্জন ও বিতরণ এবং জনস্বার্থে কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় এগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে সে ব্যাপারে এমন এক ধারণা পেশ করে যা মুসলিম পন্ডিতরা কখনোই করেননি-তাহলে আগে কেউ তার মত বক্তব্য দেয়নি এতে হাদীসের সমর্থন নেই এই অজুহাতে তার বিরোধিতা করা উচিত নয়। তবে খাঁটি ইসলামপন্থী (উসুলিয়ান)[১১] মনে করেন যে, ওহী নাযিলের সময় আরবদের মৌলিক ধ্যান-ধারণার বাইরে কোন অর্থে উপনীত হওয়া যাবে না। তাদের অবস্থানও সুচিন্তিত ভিত্তির উপার স্থাপিত তবে তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

আল মু'য়াফাকাত এর গ্রন্থকার আল সাতিবি বলেন,

> নিরক্ষরদের শরীয়ত (উম্মীয়াত আল শরীয়া) [নিরক্ষর লোকদের অনুধাবনের জন্য প্রণীত] এর কিছু কিছু বিষয়

তার জনগণ- আরবদের জন্য প্রণীত হলে ধরে নেয়া হবে তার ভিত্তিতেই বিধিবিধান রচিত হয়। এর একটা পরিণতি হতে পারে যে, বহু লোক পবিত্র কোরআন থেকে এই প্রত্যাশা করে যে, কোরআনে ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, শব্দার্থবিদ্যা ছাড়াও সমসাময়িক ও পূর্বেকার জাতিসমূহের জ্ঞাত সকল পাকৃতিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকুক। কিন্তু ইতিপূর্বেকার অনুসৃত নীতির সাথে তা' খাপ খায় না। সম্মানিত পূর্ব পুরুষগণ পবিত্র কোরআন, এর বিজ্ঞানময়তা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। তথাপি তারা সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ এবং কিয়ামত সম্পর্কিত ধারণার বাইরে কোন বিষয় মতামত দেননি। হ্যাঁ পবিত্র কোরআনে আরববাসীর জানা ও পরিচিত বিজ্ঞানের কথা বিধৃত রয়েছে। অবশ্য এই সন্নিবেশিত বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানী লোকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছে[১২]।

পবিত্র কোরআন আইন কানুনের উৎস এবং আরবদের মত নিরক্ষর জাতির প্রতি নাযিল হয়েছিল-আল-সাতিবীর মতামত এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোরআনের ধারণা এবং রচনাশৈলী আরবদের নিজস্ব অনুধাবনের সামর্থ দ্বারা নির্ণীত হয়। বহুলোক শ্রদ্ধেয় আলেমের এই ধারণাকে অত্যন্ত ভ্রমাত্নক বলে মনে করেন। কারণ পবিত্র কোরআন প্রতিটি কালের ও স্থানের মানুষের জন্য নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে নাযিল হয়েছিল। ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধিসহ আরবী ভাষা এই বাণী বহনের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন ছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আরবদের এ মনমানসিকতা ভাষাতত্ব অথবা অন্যনা অর্থের ব্যাপারে তারাই একমাত্র সমঝদার ছিল। তাছাড়া পবিত্র কোরআনে এমন বহু বিষয়ও রয়েছে আরবরা যা ইতিপূর্বে তারা জানতো না বা বুঝতো না। এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ বলেছেনঃ এগুলো হচ্ছে অজানা কাহিনী যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। ইতিপূর্বে তুমি অথবা তোমাদের কেউ এ ব্যাপারে জানতে না (১১ঃ৪৯)।

পবিত্র কোরআন নাযিলের সময় আরবদের উদ্দেশ্যে এমনভাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে যাতে তারা সহজেই বুঝতে পারে। পরে সমঝোতার পরিধি বাড়ানো হলো এবং মূল রচনায় অবতীর্ণ নতুন নতুন পরিস্থিতি ও প্রভাবে নানা ধরনের অর্থের সৃষ্টি হয় যা ভাষাগত সীমাবদ্ধতায় সীমিত ছিল না। এটা কার্যত পবিত্র কোরআনের মু'জিজার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যুগ যুগ ধরে একটি

একক গ্রন্থ-সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন এবং একই অক্ষর ও শব্দ সমন্বিত থেকেও বিভিন্ন প্রয়োজনের জবাব দিতে সক্ষম হবে। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর বরাত দিয়ে তিরমিজি শরীফে বলা হয়েছে কোরআনের মু'জিজা কখনো শেষ হবে না। যদি বলা হয় কোরআনের মূল বক্তব্যে ভাষাতাত্বিক অর্থের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই, একথার অর্থ কোরআনের ম'জিজার সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তা সময় ও স্থান দ্বারা সীমিত। কোন আয়াত সম্পর্কে পূর্ব পুরুষরা বিশেষ কিছু উল্লেখ না করে থাকলে তার অর্থ এ নয় যে, এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে, যেসব বিষয়ে তারা অভিজ্ঞ ছিলেন যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেসব ক্ষেত্রেই তারা ব্যাখ্যা করেছেন।

এসব বিষয় থেকে জানা যায় যে, কোরআন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পর্ক সব সময়ই বিদ্যমান।

১) কোরআন থেকে বিভিন্ন রকম জ্ঞান -বিজ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাওতীদ[১৩], তাশরী (আইন প্রণয়ন) এবং উসূল (আইনের উৎস)।

২) এর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য বিজ্ঞান। এগুলি হচ্ছে ভাষা বিজ্ঞান এবং বালাগাহ (অলংকার শাস্ত্র)।

৩) এমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আভাস দেয়া হয়েছে যা কুরআন বুঝতে সহায়ক হয় এবং তার ওপর আস্থা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বহু মানবিক এবং সমাজ বিজ্ঞান ও কতিপয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং কতিপয় ফলিত বিজ্ঞান ।

(৪) তাছাড়া এমন সব বিজ্ঞানও রয়েছে যার সাথে কোন দিক দিয়েই এর সম্পর্ক নেই। সুতরাং আধুনিক ইসলামিক সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়াবলী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামিক চিন্তা ধারার পদ্ধতি কৌশল সংস্কার এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সর্ব পর্যায়ে এর উদ্দেশ্য হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর[১৪] সংগে সর্বোত্তম উপায়ে এসব বিষয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করা। চারটি নীতির ভিত্তিতে এটা হতে পারে।

এসব নীতির প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে ইসলামিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পবিত্র কোরআনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলিম মানস এবং এর মধ্যেকার বিভক্তির অবসান এবং কোরআনকে সমসাময়িক মুসলমানদের জ্ঞানের প্রধান উৎসে পরিণত করা-যেমনটি ছিল অতীতে। তখন আমাদের পূর্ব

পুরুষগণ জীবন, মানুষ এবং মানবিক বিধি বিধান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সার্বিক জ্ঞানার্জনের জন্য তার (পবিত্র কোরআনের) আশ্রয় নিতেন।

দ্বিতীয় নীতি হওয়া উচিত রাসূলে করিমের(দঃ) সুন্নাহ অনুধাবনের জন্য একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং একটি ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণে তা ব্যবহার করা।

তৃতীয় নীতি প্রণীত হবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ঐতিহ্য অনুধাবনের জন্য সুষ্ঠু পদ্ধতির প্রয়োগ, আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি গঠনে তার ব্যবহার এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ।

চতুর্থ নীতি হবে উপলব্ধির পন্থা যাচাইয়ের মাধ্যমে সমসাময়িক আরব চিন্তা- ধারার প্রতি মনোনিবেশ, তার ব্যবহার এবং তা থেকে উপকারিতা লাভ। পবিত্র কোরআন অনুধাবন ও প্রয়োগের জন্য পদ্ধতির উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দানের কৌশল। এই প্রসংগে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গবেষণা ও সমীক্ষায় মনোনিবেশ করার জন্য একটি "কোরআন ফাইল" তৈরী করতে হবেঃ

১) পবিত্র কোরআন অনুধাবনের পন্থা এবং কুরআনকে আধুনিক মুসলমানদের সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং দিক- নির্দেশনার প্রাথমিক উৎসে পরিণত করা।

২) পবিত্র কোরআনের তাফসীর, তাবীল(অর্থের ব্যাখ্যা), শ্রেণী বিন্যাস ও অনুক্রমণিকা, ইতিপূর্বেকার এবং বর্তমান মুসলিম বিজ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা।

৩) অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) সুষ্ঠু উপায়ে পবিত্র কোরআনের বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুসলিম মেধার পুনরুজ্জীবন এবং (খ) পবিত্র কোরআনকে আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতি জ্ঞান- বিজ্ঞান এবং সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও যথার্থ স্থনে পুনর্বহাল করা। এরপর মুসলিম বুদ্ধিমত্তা পুনর্গঠিত সংশোধিত হবে এবং পবিত্র কোরআন তার আলোক বিতরণের ভূমিকা পুনরায় গ্রহণ করবে।

উল্লিখিত "কোরআন ফাইল" উদ্বোধন করা হয়েছে। শায়খ মুহাম্মদ আল[১৫] গাজালীর *কায়ফা নাতা আ'মাল মা'আলকোরআন* শীর্ষক গ্রন্থে। এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অতঃপর সেমিনার ও সমীক্ষা পরিচালিত হবে।

নতুন সচেতনতার দিক নির্দেশ করে এই গ্রন্থে পরিবর্তনশীল বিশ্বের বাস্তব প্রেক্ষাপটে কোরআনকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কার্যত কোন ব্যক্তির এই ধারণা নিয়ে এই গ্রন্থের ব্যাপারে কাজ করা উচিত হবে না

যে গ্রন্থটি কোরআন এবং ইসলামিক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে বহু ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করতে গিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সকল প্রশ্নের জবাব দেয় এবং সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। তথাপি এটা আধুনিক ইসলামিক পদ্ধতিগত সচেতনতা সৃষ্টির প্রথম ধাপ। এ ব্যাপারে মানবিক প্রেক্ষিতে ইসলামিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

এই সমীক্ষা এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ গ্রন্থরাজি ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে না। প্রকারান্তরে এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে সেগুলির প্রমাণিত (Authenticated) এবং সকল ইসলামিক মাযহাব ও ভাবধারার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়, বিশেষ করে যেসব চিন্তাধারা অধঃপতন, পশ্চাদপদতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার যুগের আগে যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি পোষণ করবে।

বুদ্ধিমান, যুক্তিপ্রবণ মনুষের কাছে পবিত্র কোরআনকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামিক দায়িত্ববোধ পালনের জন্য একে নিয়োজিত করতে হবে। এই গ্রন্থটি বহুসংখ্যক সমালোচনামূলক নিবন্ধ নিয়ে রচিত। বিভিন্ন বিষয় এ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে-অন্যক্ষেত্রে রয়েছে পদ্ধতিগত নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোরআনিক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর-যে ক্ষেত্রে সমালোচনা বা বিশ্লেষণ ছাড়া বিদ্যমান যে কোন ধারণা অন্ধভাবে মেনে নেয়া হয় না।

পবিত্র কোরআন এমন একটি উৎস যা থেকে পন্ডিতরা তাঁদের নিজস্ব বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক কিছু সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে বিশ্বকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই মহাগ্রন্থ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে; অবশ্য মানবিক চিন্তাধারার ঐতিহাসিক বিকাশের সাথে তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্নতর হয়েছে। যে ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করে তার দৃষ্টিভংগি সেই চয়নকারী পাঠক থেকে ভিন্নতর হবে যিনি যথাযথ প্রেক্ষিত ছাড়া এক একটি আয়াত বিচ্ছিন্ন করে অধ্যয়ন করেন। একইভাবে কোন ব্যক্তি এই মহাগ্রন্থকে দেখেন গল্প, আইন-কানুন, উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের একটি সংকলন হিসেবে। আবার অন্য পাঠক এটাকে দেখেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ হিসেবে যাতে মহাজাগতিক ও গতিশীল অস্তিত্ব আলোচিত, যার মাধ্যমে তিনি এই বিশ্বজগত, তার চলাচল এবং সময় ও স্থানের অব্যাহত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভ করতে পারেন।

পবিত্র কোরআন তার নিজস্ব বিশেষ গুণাবলীর কথা ব্যাখ্যা করে বলেছে, এতো একটি পরিপূর্ণ ঐশী গ্রন্থ যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কালের সকল ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

> (হে নবী) যে কিতাব আমরা তোমার প্রতি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি তাহাই সত্য-সেই কিতাবগুলির সত্যতা প্রমাণকারী যেগুলো তার পূর্বে এসেছিল। আল্লাহ্ তার বান্দাহদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন। পরে আমরা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি সেই লোকদের যাদেরকে আমরা আমাদের বান্দাহদের মধ্যে হতে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেহ তো নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেহ মধ্যমপন্থী আর কেহ আল্লাহর অনুমতিক্রমে নেক কাজে অগ্রসর। এটাই বড় অনুগ্রহ (৩৫ঃ ৩১-৩২)।

এসব আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন তার নিজস্ব পুনঃনবায়ন প্রক্রিয়ায় যুগ যুগ ধরে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত জবাব দিয়ে থাকে।

> অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। নিশ্চয়ই এটা এক মহাশপথ-যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কোরআন যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক-পবিত্র তারা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৫৬ঃ৭৫-৭৯)।

কোরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই পবিত্র কোরআনের রয়েছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য-এটা শাশ্বত অভ্রান্ত এবং অতি পবিত্র আসমানী কিতাবঃ

> আমরাই নিঃসন্দেহে আয়াত নাযিল করেছি এবং আমরাই তা রক্ষা করব (১৫ঃ৯)। সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এটা একটি প্রামাণ্য রেকর্ড যা তাদের কাজে লাগবে।

> হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার পূর্বেও যখনি রাসুল পাঠিয়েছি, তো মানুষ পাঠিয়েছিঃ যাদের প্রতি আমরা আমাদের পয়গামসমূহ অহী করতাম। এই যিক্রওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, যদি তোমরা নিজেরা না জান। অতীতের নবী, রাসূলদেরও আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও কিতাবসমূহ

> দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন এই যিকর তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরাও চিন্তা গবেষণা করে (১৬ঃ৪৩-৪৪)

ইতিপূর্বেকার আসমানী গ্রন্থের বিকৃতি ও পরিবর্তনের মোকাবিলায় এটি এক শাশ্বত গ্রন্থ।

> ইতিপূর্বে আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তখন তার ব্যাপারেও এরকম মতভেদ হয়েছিল। তোমার খোদা যদি প্রথমেই একটি কথা সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তাহলে এই মতভেদকারীদের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া যেতো। আর এই লোকেরা কঠিন বিপর্যয়কারী সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে (৪১ঃ৪৫)।

তদুপরি কোরআনের রয়েছে অন্যান্য আরও গুণ। অহী নাযিলের সময় বিশেষ পরিস্থিতির (এ সময় বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত ছিল বিক্ষিপ্ত) অবসানের পর এই মহাগ্রন্থ আল্লাহর নির্দেশেই পদ্ধতিগত কাঠামোগত ঐক্যে সাজানো হয়। আল কোরআন ঐশীভাবে সংরক্ষিত এবং সময়ের প্রয়োজন অনুসারে তার রত্নরাজি উন্মোচনের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা সমাধানে তার চিরন্তন অবদান থেকে এই মহাগ্রন্থের গুণাবলী উপলব্ধি করা যায়-যেহেতু এটা বিশ্বজগত, তার আন্দোলন এবং তার সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। সে জন্য এটা সময়, স্থান এবং পরিবর্তনের উপর আধিপত্য বিস্তারী। এতে মহান আল্লাহর জ্ঞান সহ সমগ্র অস্তিত্বের চেতনা বিধৃত। সুতরাং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধররা কোনক্রমেই এই মহাগ্রন্থের চূড়ান্ত অধিকারী হতে সক্ষম নয়। পরিবর্তে তারা তাদের নিজস্বকালের চিন্তা প্রবাহ এবং সভ্যতা, সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে এই গ্রন্থ থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকে।

শায়খ আল গাজালীর গ্রন্থের গুরুত্ব নতুন ব্যাখ্যা দানের জন্য নয় বরং জ্ঞানার্জন এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতির প্রতি দিক-নির্দেশনার আগে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারাকে বহু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত করার প্রয়াসই এর গুরুত্ব। ইসলামী সমাজেই এটা অর্জন করা যেতে পারে এবং বিশ্বে ঘটমান পরিবর্তন ও তার পরিণতি সব কিছুই এ সমাজে অধিকৃত হয়েছে বলে আমরা দাবী করি না, তবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলতে পারি। যে কোন ক্ষেত্রে চিন্তাধারা ও লক্ষ্যের সার্বজনীনতার ধারণা একটি ইসলামিক গুণ। মহানবীকে (দঃ) শেষনবী *(খাতামুননবীঈন)* এবং আল কোরআনকে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত

আসমানী কিতাব হিসেবে উল্লেখ করে ইসলাম প্রথম বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করে। তদুপরি পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূর্বে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে ইসলামী সভ্যতাই হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের উত্তরণকারী (Dichotomy) এবং তা প্রাচীন বিশ্বের মধ্যাঞ্চল বরাবর বহু সভ্যতা এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে।

ইসলামিক কাঠামোয় বিশ্বজনীনতা গভীরভাবে প্রোথিত; এজন্য বিশ্ব সভ্যতার সংকট এবং এর ইসলামী সমাধানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে পদ্ধতিগত সচেতনতার মাধ্যমে এবং এই পদ্ধতিতে সমসাময়িক মানব চিন্তা ধারার সাফল্যকে একটি একক প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানব ইতিহাসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে-যদিও পবিত্র কোরআন কখনই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন করা হয়নি।

এবার সমসাময়িক পদ্ধতি যা সচেতনতার জন্য প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। শুধু একটি নির্দিষ্ট কাল অথবা সময় আত্মনিয়োগ অরে অথবা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অবহেলা বা উপেক্ষা করে এই সচেতনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বিকাশ ও উন্নয়ন শুধু সমসাময়িক সাফল্যের সমাবেশ এবং পুরাতন সমাজ কাঠামোয় কেবল সর্বাধুনিক আবিষ্কার জুড়ে দেওয়াই নয় বরং সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন, আর এ জন্য প্রয়োজন পবিত্র কোরআনের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভংগি এবং নতুন বাস্তবতার প্রয়োজনে নতুনতর দৃষ্টিভংগি সমসাময়িক সমাজের ধারণার অর্থ ভবিষ্যতকালের প্রেক্ষাপটে পুরাতন সমাজ এবং তার চিন্তাধারা অব্যাহত রাখা নয়, বরং এটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত এবং সমসাময়িক অভিধায় উত্তরণের জন্য সমাজের পরিবর্তন অপরিহার্য। এসব পরিবর্তনের ফলে সমাজের পুনঃ আবিষ্কার সম্ভব হবে এবং আমরাও এই পরিবর্তনশীল বিশ্বকাঠামোর আওতায় পবিত্র কোরআনের পুনঃআবিষ্কার করতে সক্ষম হবো।

এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, আমাদের অনেক আরব এবং ইসলামিক সমাজ বর্তমান কালে রয়েছে যারা ধারণায় নিজেদেরকে সমসাময়িক বলে মনে করে। তবে প্রকৃতপক্ষে তারা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে বাস করে না; এমনকি বর্তমান বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিতে সচেতনতা এবং তার সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক মানসিকতা এবং পদ্ধতিগত জ্ঞানার্জন ও আজকের সমস্যা সমাধানে তার আগ্রহের অধিকারীও তারা নয়। আরব এবং ইসলামী সমাজসমূহের প্রবণতা রয়েছে তাদের অতীত এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাধারায় আঁকড়ে থাকার অথচ তাদের বাস করতে হয় আধুনিক আন্তর্জাতিক

যুগে। এই বৈপরীত্য তাদেরকে সমসাময়িকত্বের চেতনা এনে দিয়েছে। পাশাপাশি সমসাময়িক বিশ্বজনীন সচেতনতা অর্জনের উপযোগী পরিস্থিতিতে সাড়া দেবার অপারগতা এনে দিয়েছে। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে এসব সমাজের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাদি রচনা করে চলেছেন এবং বিশ্বের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি অনুসন্ধান না করেই বর্তমানের মধ্যে অতীতকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। তারা আমাদের সত্যাশ্রয়ী সাহাবীদের সম্পর্কে ইজতিহাদের[১৬] ভাষায় যেভাবে তারা তাদের যুগে চর্চা করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করেছেন এবং সেভাবেই তারা বিষয়বস্তু রচনা করতে চান। একই সাথে এসব প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী দুই কালের মধ্যেকার ঐতিহাসিক পার্থক্য উপেক্ষা করেন এবং আধুনিক যুগে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পান না। ইজতিহাদকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে সত্যাশ্রয়ী সাহাবীদেরকে অনুকরণের আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

আমরা এই ধারা ভাঙ্গতে চাই এবং ব্যাপক অর্থে ফিকাহর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক কর্মকান্ড চিহ্নিত করতে চাই। ফিকাহর অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আইন এবং অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আইনও। আমরা এবার ফিকাহর বিভিন্ন শাখায় আইম্মাদের[১৭] (ইমাম শব্দের বহুবচন) প্রচার ওসনদ[১৮] সংশ্লিষ্ট সুন্নাহর বিভিন্ন বিষয়ে মুহাদ্দেসীনের[১৯] অবস্থান যে সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দরুন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করব।

ইতিহাস যা থেকে বাদ দিয়েছিল এবং যা শাসন কর্তৃপক্ষ এবং আলেম সমাজ ফিকাহ ও সূফীবাদ এবং যারা সুন্নাহর প্রসংগ ছাড়া কোরআন অধ্যয়ন করেছেন এবং যারা কোরআনের প্রসংগ ছাড়া সুন্নাহ অধ্যয়ন করেছেন-এসবের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা-উন্মোচিত হয়। এধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগি ফিকাহ্‌কে তার সেই যথার্থ অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে ইসলামিক পদ্ধতির অধীনে এ ধরনের বিরোধের উৎপত্তি হওয়া উচিৎ নয়। কারণ সমগ্র ইসলামী উম্মাহর কর্মকান্ড এবং গতিধারার জন্য একটি একক কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে যা হচ্ছে স্ববিরোধিতামুক্ত গ্রন্থ আল-কোরআন। এর ফলে পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতা সৃষ্টিতে আল-কোরআন তার পূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ঐশী ইচ্ছা এবং মানবীয় প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে আর সে সভ্যতার কল্যাণের অংশীদার হবে মুসলিম এবং সকল জীব।

> এবং আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেই-সব লোকদের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে (১৬ঃ৮৯)।

সুন্নাহর যথাযথ অধ্যয়ন প্রসংগে

ডঃ তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী

ইসলামের শুরু থেকে পন্ডিত ও মুজতাহিদগণের[২০] পরিচিত বিধিসমূহের কাঠামো অনুসারে সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর নির্ভরযোগ্যতা আল-কোরআনের পরেই, দ্বিতীয় স্থানীয়। কার্যতঃ এ দুটোকে পৃথক করা যায় না। কারণ, সুন্নাহ্ আল-কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে এবং কোরআনের শিক্ষা ও পদ্ধতির বাস্তবায়ন করে।

সুতরাং সুন্নাহর নির্ভরযোগ্যতা ইসলামের একটি অপরিহার্য অংগ-যে ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কেউ কখনো প্রশ্ন উঠায়নি। তবে পরবর্তী বংশদরদের মধ্যে স্বল্প জ্ঞান ও হেকমত সম্পন্ন এমন অনেক লোক ছিল যারা রসূলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীছ তথা সুন্নাহর সাথে প্রাথমিক যুগের কাহিনী এবং সংক্ষিপ্ত ঘটনাপুঞ্জির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। তারা জানে না এ ধরনের ঐতিহাসিক অথবা সংক্ষিপ্ত রিপোর্টসমূহের কতটুকু প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করা যায়; মানুষের জ্ঞানের পরিস্ফুটনের মাধ্যম হিসেবে এগুলি কি রকম মূল্যবান; অথবা যুক্তিধর্মী চিন্তাধারা বা বাস্তব প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার পরেও এগুলিকে প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা। এসব স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন লোক ধারণা করে যে, এই পদ্ধতিগত দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা খোদ সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ। তারা সুনানকে (আচরণ ও কর্মকান্ড) বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিবরণ হিসেবে এবং এই বিবরণকে মনে করে শুধুমাত্র বিবরণী হিসেবে এবং অধিকাংশ বিরোধ কেন্দ্রীভূত হয় বিবরণীসমূহের উপর। তারা মহানবী (সঃ) এর সুন্নাহ ও দিক নির্দেশনার এবং যে পন্থায় এগুলি (পরবর্তী পর্যায়ে) প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যেকার ব্যাপক ব্যবধান অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তদুপরি রসূলের কার্যক্রম, কর্ম এবং বক্তব্যের রিপোর্ট করার পদ্ধতি এবং অপরাপর লোকদের ব্যাপারে রিপোর্টিং-এর মধ্যে তারা কোন পার্থক্য দেখতে পায়নি। এই দুঃখজনক বিভ্রান্তির ফলে, খোদ সুন্নাহ্র নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে যার ফলে 'উসূল' ও 'হাদীছের' গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই শ্রম অনায়াসে কাজে লাগানো যেতো সুন্নাহ অনুধাবন, ব্যাখ্যা এবং তা থেকে শিক্ষা নেয়ার লক্ষ্যে সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে, এভাবে প্রতি যুগের ও স্থানের মুসলমানদেরকে এর শিক্ষার আলোকে চিন্তাধারা ও জীবন পদ্ধতি গড়ে তুলতে সাহায্য করা যেতো।

সাধারণভাবে রিপোর্টসমূহ এবং বিশেষভাবে 'আহাদ'[২১] এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে অহেতুক ও ইচ্ছাকৃত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের ফলে

নেতিবাচক, অত্যন্ত মারাত্মক ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছে। এবং গবেষণা ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে। এর পরিণতিতে বহু গ্রন্থ বিমূর্ত ও অস্পষ্ট আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে যার কোন ইতিবাচক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা বাস্তব প্রভাব ছিল না। কোরআনের প্রেক্ষাপটে সুন্নাহর মর্যাদা এবং কোরআন কর্তৃক সুন্নাহ বাতিল প্রভৃতি বিতর্কে মুসলমানরা অহেতুক দীর্ঘ ও পুনঃপৌনিক সমালোচনা এবং ঐতিহাসিক রিপোর্ট, বর্ণনাকারী এবং কর্তৃত্বের ধারাক্রমের (Chains of authority) প্রামাণ্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত হয়। মূল গ্রন্থের সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের পদ্ধতিসমূহ এবং সময়-কাল পরিবেশে ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে হাদিছ পরিবেশন, তার পর সনদ পর্যালোচনায় নিবেদিত ব্যাপক প্রচেষ্টা ও বহুসংখ্যক গ্রন্থের সাথে তুলনা করা হলে যে কেউ তৎপরবর্তী সমস্যা ও বিভ্রান্তির প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারতো।

অবশ্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। এধরনের গ্রন্থে শুধু আইনগত দিক আলোচিত না হয়ে সুন্নাহর সকল দিক স্থান পেলে উম্মাহ্‌র প্রয়োজন আরো বেশী করে পূরণ হতো। যেহেতু সুন্নাহ সার্বিকভাবে বিশেষ ধরনের আদর্শিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে কোরআনের পদ্ধতিগত বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্দেশনার ধারাক্রমের প্রতিনিধিত্ব করে সেজন্যে সুন্নাহ অনুধাবনের পদ্ধতিগত সমীক্ষা হচ্ছে 'উসূল' হাদীস শিক্ষার অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দিক। এ সময় ইসলামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাস্তবায়িত করা হচ্ছিল এবং ইসলামের আদর্শ বাস্তবে রূপ দিতে এবং ইতিহাসের এই কালকে (সময়) এমন যুগে পরিণত করতে পবিত্র কোরআন স্বয়ং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে যাতে ভাবী বংশধরদের অনুসরণের জন্য এটা হয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এভাবে আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নে সুন্নাহ উচ্চতম, সর্বাধিক স্বচ্ছ, উত্তম ও সত্যিকারের ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। আল কোরআনের নিয়ম সম্পর্কিত বিজ্ঞানের এটা এক বাস্তববাদী, বিদগ্ধ ও সার্বিক প্রতীক। কোরআন নাযিলের সময় যেভাবে যে রূপে ছিল তা সংরক্ষণ এবং কোনরকম বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করাই বোধ হয় খোদা তায়ালার ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করেছে। মহানবী (সঃ) স্বয়ং কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষণের অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং প্রতিটি স্বরবর্ণ ও যতি চিহ্ন বহাল রেখেছেন। এ জন্য অব্যাহত হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, কোরআনের প্রতিটি অক্ষর নাযিল কালের মতই অক্ষুণ্ন রেখে প্রচার করতে হবে-শব্দান্তরিত আকারে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু সুন্নাহর বিষয়টি এরকম নয়। সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করা হলেও তার ওপর উপরোক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি। তাছাড়া পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহানবী(স:) হাদীস লিখে রাখাও ব্যবস্থা করেননি। এছাড়া তিনি কোরআনের ন্যায় জিবরাইলের সাথে এ নিয়ে মুখ আওড়াননি(কণ্ঠস্থ করেননি)। দৃষ্টিভংগির এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে মহানবীর(স:) মত মানব সামর্থের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে সুন্নাহ বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে বিরাজ করুক। মহানবী(স:) আল-কোরআনের অনুসরণ করেছেন সর্বাত্নকও চূড়ান্তরূপে। বস্তুতঃ দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পার্থিব কার্যক্রমে তিনি এর নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান প্রয়োগ করেছেনঃ করেছেন ধর্মপ্রচার, মিক্ষা দান, নিষেধাজ্ঞা দান, উপভোগ, পরামর্শ, ও উপদেশ দান, বিচার কার্য, ফতোয়া[২২] দান, নির্দেশ দান, শৃঙ্খলা বিধান, যুদ্ধ পরিচারনা, শান্তি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন, ক্রয়-বিক্রয় ,বার্তা বিনিময়, বিবাহ, তালাক, নির্মাণ,ধ্বংস,ভ্রমণ---প্রভৃতিতে।

আল-কোরআনের নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান নবীজীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করেছে। কোরআনের অনেক আয়াত এই নিয়ম বিজ্ঞানের মূল্যায়ন করেছে এবং প্রয়োজন বোধে সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও সংশোধন ও পরিচালিত করেছে। কারণ প্রয়োগ প্রক্রিয়া মানবিক সীমাবদ্ধতা ও সময় স্থানের দরুন শর্তাধীন ছিল। এজন্য আল্লাহ বলেন, যতদূর পার, আল্লাহর স্মরণে থাক।

নবী করীম (সঃ) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কোরআনের নিয়ম বিজ্ঞান প্রয়োগ করার সময় নবী করীম (সঃ) এর প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে মূল্যায়ন করা উচিৎ। কারণ মহানবী (সঃ) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত ঝোঁকপ্রবণতা ও স্বতস্ফূর্ত প্রভাবে সংবেদনশীল হতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জনসাধারণ নামাজ কালামের ক্ষেত্রে নবী করীম (সঃ) কেই অনুসরণ করেছে। অনুসরণ করার পরিবর্তে তারা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতো। কারণ কোন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে মেধাকে সংশ্লিষ্ট করে একটা সচেতন কর্মতৎপরতা- এজন্য প্রয়োজন এই দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করে সকল উপকরণের বিষয়কে সচেতনতার সাথে অনুসরণ করা। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট (International Institute of Islamic Thought) বর্তমানে মুসলিম পন্ডিতদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎস ব্যবহারের জন্য সুন্নাহর অনুধাবন, এর ব্যাপক ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণ এবং যথাযথ দৃষ্টিভংগির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এটা বিশেষভাবে এজন্য প্রয়োজন যে মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনর্গঠনে মৌলিক পূর্বশর্ত হিসেবে ইসলামের ভিত্তি ও উৎস এবং যেগুলি অনুধাবনের পন্থা ব্যাখ্যা করা জরুরী। এই লক্ষ্য অর্জনে ইনস্টিটিউট কতিপয় কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রথমতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেসব বিষয়ে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করা হয়েছে তার পরিবর্তে এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত বিষয় এবং যার সমাধান প্রয়োজন তার প্রতি, 'উসূল' ও হাদিছ শিক্ষার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। এ প্রসঙ্গে ইনষ্টিটিউট মনে করে, যেহেতু আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আস্থাশীল কোন মুসলমান সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে পারে না, সেজন্য সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রশ্নটা চূড়ান্তভাবে আলোচিত হয়েছে। ইনস্টিটিউট প্রখ্যাত 'উসূল' বিশেষজ্ঞ শেখ আব্দুল গনি আব্দুল খালেক প্রণীত 'হুজিয়াত আল সুন্নাহ' (সুন্নাহর আইনগত কর্তৃত্ব) গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। গ্রন্থটি এ বিষয়ের ওপর একটি মূল্যবান পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয় এ ক্ষেত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং ইনস্টিটিউট এটিকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে।

ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউট বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত ও গবেষকদের কাছে সুন্নাহ্‌কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস চালিয়েছে। ইনস্টিটিউট এই লক্ষ্যে কর্মরত বহু পন্ডিতকে ইতিমধ্যেই সহযোগিতা দিয়েছে।

তাছাড়া ইনস্টিটিউট বিষয়গতভাবে সুন্নাহর শ্রেণীবিন্যাস শুরু করেছে। শুধু ফিকাহ্‌র উৎস হিসেবে সীমিত না রেখে সুন্নাহ্‌কে সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞানের উৎস হিসেবে পরিণত করার আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সাথেও সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে (Finally) ইনস্টিটিউট বিশিষ্ট পন্ডিতদের ইসলামী সভ্যতার পুনর্গঠনে সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন দিক এবং তার ভূমিকা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর কাজ শুরু করেছে। সুবিখ্যাত পন্ডিত শেখ মুহাম্মদ আল গাজালীর ইতিমধ্যেই একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থঃ আল সুন্নাহ বায়না আহলাল ফিকাহ্ ওয়া আহলাল হাদিছ' (ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞ ও হাদিছ বিশেষজ্ঞদের মাঝে সুন্নাহ)[২৩] রচনা করেছেন গ্রন্থটিকে সুন্নাহ অনুধাবনের পদ্ধতি সম্পর্কে দেয়া হয়েছে এবং যারা সনদের কাঠামো ও রিপোর্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট ও যারা সুন্নাহ অনুধাবনের আগ্রহী ও তা থেকে শিক্ষা নিতে চায়, তাদের মধ্যেকার পার্থক্য টানা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের মতে, এই বিদগ্ধ পন্ডিত গ্রন্থ রচনায় এত অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী যে, গ্রন্থ প্রনয়নে কারো নির্দেশ বা ভুল ত্রুটি সংশোধনে কারো নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে না। তবে তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতিপয় বিস্তারিত তথ্য ও ব্যবহৃত উদাহরণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে হৈ চৈ এত বেশী হয়েছে যে, এসব তুচ্ছ বিবরণের জন্য গ্রন্থটির মূল মর্মবাণী প্রায় তলিয়ে গেছে।

এই গ্রন্থটি মূলতঃ রচিত হয়েছিল সেই সব লোকদের জন্যে যাদের শরীয়া এবং গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান নেই এবং যাদের ইতিহাস, সীরাত[২৪], ফিকহ্ ও আরবি জ্ঞান শুদ্ধরূপে হাদিস অনুধাবনের জন্যে যথেষ্ট নয়। বহু লোক হাদীস অধ্যয়ন শুরু করে এবং তার প্রকৃতি অথবা নবী করিম (স:) এর বক্তব্যের বা কাজের কথিত কারণ না বুঝে অথবা হাদীসের সাধারণ ভাষ্য অনুধাবন না করেই পড়ে যায়। তাদের এই অনুধাবন ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর এবং এরফলে তারা হাদিসের একটি বিকৃতি ধারণা লাভ করে এবং এটা তারা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এসব লোক এতদূর পান্ডিত্যের দাবী করে যে, কোরআনের ওপরে রয়েছে সুন্নাহর প্রাধান্য এবং তা স্থগিতও করতে পারে। তদুপরি যদি তারা কোন অধিকতর সহীহ্ হাদীসের সম্মুখীন হয় যা তাদের যুক্তির বিপক্ষে যায় তখন তারা তার মতদ্বৈধতার প্রকৃতি বুঝতে পারে না। এধরনের হাদীস মূল্যায়নের পন্থা-এমনকি আলোচ্য হাদীস অনুধাবনের জন্য সঠিক পদ্ধতি ও বিধিও বুঝতে পারে না।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সুন্নাহর অধ্যায়নে নিয়োজিত পন্ডিত ও গবেষকদের উদ্দেশ্যে। তাদের পরামর্শ দেয়া হয় সুন্নাহর অনুধাবনের সুষ্ঠু পদ্ধতির জন্য তারা যেন কিছুটা দৃষ্টি দেন। কারণ সুষ্ঠু উপলব্ধি ছাড়া কোন হাদীস নেই এবং সুন্নাহ ছাড়া কোন ফিকাহ, ইসলামী সভ্যতা বা সত্যিকার জ্ঞান থাকতে পারে না।

শেখ আল গাজালীর গ্রন্থের বিভ্রান্তির ব্যাপারে ইনস্টিটিউট সচেতন হয়ে তারা ডঃ ইউসুফ আল কারাদায়ীকে অনুরোধ করেন দুটি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখতে। এর একটি হচ্ছে সুন্নাহ অনুধাবনের পন্থা এবং অপরটি জ্ঞানের উৎস হিসেবে সুন্নাহ। প্রথমটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে 'কায়ফা না'তা আমল মা'আল সুন্নাহ আল নাবাবিয়াহ' (সুন্নাহ অনুধাবনের পন্থা) এই শিরোনামে এবং দ্বিতীয়টি যথাসময়ে প্রকাশিত হবে ইনশা'ল্লাহ[২৫]।

সমকালীন ইসলামিক জীবন ধারা বিনির্মাণে সুন্নাহর ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যেসব বিষয় সিদ্ধান্তমূলকভাবে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে তার পরিবর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ইসলামী উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদীস শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সুন্নাহর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভংগি অন্তর্ভুক্ত করা।

আশা করা যায় যে, মুসলমানরা সুন্নাহর উপলব্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান অধিকতর আগ্রহ দেখাবে। এ ধরনের উপলব্ধির বিধি বিধান (Rules and conditions of such understanding)তাদেরকে জানতে হবে ও প্রচার করতে হবে এবং সুন্নাহ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির কারণ জানার জন্যও গভীর

আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে যুগপৎ সংঘটিত ঘটনাবলী (Overlapping issues) কেন সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং কেমন করে এই সংকটের ফলে সুন্নাহর কর্তৃত্ব সংক্রান্ত বিতর্কে দার্শনিক যুক্তিপ্রয়োগ শুরু হয়েছে। সুন্নাহর উপলব্ধির জন্য একটি সার্বিক পদ্ধতিগত দৃষ্টিভংগি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তিনটি প্রশ্নের সুগভীর গবেষণা প্রয়োজন।

(ক) উপলব্ধির শর্তাবলী

যদি শুদ্ধরূপে উপলব্ধির প্রশ্নটি সুন্নাহর ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মতানৈক্য ও বিভ্রান্তির কারণগুলি কি? সুষ্ঠু অধ্যয়ন ও উপলব্ধির জন্য কি ধরনের গুণাগুণ ও যোগ্যতা প্রয়োজন? ইসলামের প্রতি অস্বীকার উপলব্ধির জন্য পূর্বশর্ত কি? কারো সার্বিক অন্তর্দৃষ্টির কমতি কেমন করে পূরণ করা যাবে? কেমন করে আমরা এই সংকটের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করতে পারব? কেমন করে আংশিক চাপা সমস্যাবলীর প্রশ্নের সমাধান করবো যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং যা অনেক গবেষকের মতে, সুন্নাহর সার্বিক বিষয়ে না হলেও আংশিকভাবে কর্তৃত্বের (Authority) ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কের ফলে যুক্তিতর্ক ও অহংকারীদের পক্ষে অজুহাত দাঁড় করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ইসলামের ইতিহাসে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টি কখনোই সমস্যা সৃষ্টি করেনি।

(খ) মতপার্থক্য ও বিভাগ

উম্মাহ কেন ও কি জন্য নানা ফেরকা ও তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেল? সুন্নাহ্ ও তার কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা, অনুধাবন ও প্রচারকে কেন্দ্র করে কিভাবে বিভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হলো? সুন্নাহ কিভাবে ইসলামের বিভিন্ন ফেরকা ও তরিকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হলো? জাল হাদিছ, হাদিছের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং সুন্নাহ থেকে আইনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠলো কেন? এসব ঘটনা বিভিন্ন গ্রুপের বিকাশে কি প্রভাব ফেলেছে এবং হাদিছ অধ্যয়ন ও রাবীদের (হাদিছ বর্ণনাকারী) বর্ণনা পরস্পর বিশ্লেষণে বিশেষ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে? পূর্বেকার 'উসুল' এর পন্ডিতবর্গও খুঁটিনাটি বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের (Scholastic theologians) আলোচিত ব্যাপারে সুন্নাহ্র অধ্যয়নে এসব বিষয় সম্পৃক্ত হলো কেমন করে? এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, সুন্নাহ্র কর্তৃত্ব, কোরআনের প্রেক্ষাপটে তার মর্যাদা, কতিপয় আয়াত মন্‌সুখ হওয়া, কোরআনের আলোচনায় তার ব্যাখ্যা ও সীমা নির্দেশ করা, মহানবীর (সঃ) ইজতিহাদ, এই সম্পর্কেও বর্ণিত হাদিছ (Spoken Sunnah) এবং এসব ব্যাপারে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মূল্যায়ন ইত্যাদি।

এখন এসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষাগত দৃষ্টিভংগিতে মুসলিম মানসের ওপর কি প্রতিক্রিয়া ফেলেছে? কোন ঐতিহাসিক প্রক্ষিতে এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে? এর বৃদ্ধিবৃত্তিক তাৎপর্য এবং এগুলি এ পর্যন্ত কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? আধুনিক সুন্নাহ সমীক্ষায় এবং এ ধরনের সমীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সর্বোত্তম উপায় কি? মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং সভ্যতার পুনর্নির্মাণে উম্মাহ্কে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কিভাবে সর্বোত্তম দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করা সম্ভব।

(গ) সুন্নাহ্র উপলব্ধিতে স্থান ও কালের গুরুত্ব

প্রথম প্রজন্মের মুসলমানদের ন্যায় উসুলিয়াগণ মহানবী(সঃ)-এর কার্যক্রম ও বক্তব্য এবং তার অভিজ্ঞতার মানবিক দিকের বিশেষ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রেক্ষিতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং এসব বিষয় বিবেচনা করার জন্য কতিপয় বিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের হাদিস অধ্যয়নের সময় বিশেষজ্ঞরা কি কতিপয় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারেন? এ প্রসঙ্গে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এসব রূপরেখার ব্যাখ্যায় আধুনিক হাদিছ সমীক্ষার ভূমিকা কি?

একদিকে ফকিহদের আলোচিত ছোটখাট বিষয় এবং চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও মোতাকাল্লিমদের আলোচিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় এবং অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচিত সামাজিক কার্যক্রমের ব্যাপারে অপরিহার্য পার্থক্য জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সুন্নাহ্র অনুধাবন ও প্রয়োগের বহুবিধ পন্থা ও পদ্ধতি। ফকিহদের আওতাভুক্ত একটি ছোটখাট বিষয় সংক্রান্ত হাদিস থেকে সাধারণ সামাজিক বিষয়ের হাদিস আলাদা ধরনের। এ ধরনের হাদিছের ব্যাখায় এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সামাজিক দিক বিবেচনায় আনতে হবে এবং সমাজ বিজ্ঞানী তার বিশ্লেষণেও এ বিষয়টি দেখবেন। উম্মাহর দীর্ঘস্থায়ী বিভেদ থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পাব? এই বিভেদের ফলে একই হাদিছ প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণার সমর্থনে অপপ্রয়োগ করা হয়। একেক গ্রুপ তাদের বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে কেমন করে রেহাই পাবে? ইসলামী চিন্তাধারার পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি আমরা কিভাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং দুষ্টচক্র থেকে রেহাই পাব যে সময় সুন্নাহ (হাদিছ) সংগ্রহ করা এবং পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা ও বিতর্কানুষ্ঠান এবং এই লক্ষ্যে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়টি সহজতর হয়ে পড়েছে?

উম্মাহ্র সমস্যা সমাধানে সুন্নাহর ভূমিকা

সাধারণভাবে ইসলামী বিশ্ব এবং বিশেষভাবে আরব বিশ্ব নানা সংকটে ভুগছে, যার ফলে ইসলামী চিন্তাধারার সন্ধিক্ষণ চলছে। এই সন্ধিক্ষণ নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ভিতর গুরুত্বপূর্ণগুলো হচ্ছে ঃ

ক. উম্মাহ্র বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে সংহতির অভাব, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, উপদলীয় রাজনৈতিক বিষয়ে বিরোধপূর্ণ চেতনা, উম্মাহ্র মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী আদর্শের পুনরুজ্জীবন অথবা পূর্বে ছিল না এমন আদর্শের উদ্ভাবন।

খ. অন্যান্য সামাজিক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীল উপাদানের ঘাটতি, স্বার্থপর, একদেশদর্শী ও উপদলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং বর্তমান সম্পর্কে নৈরাশ্যভাবে বিদ্যমান ইতিবাচক কাজের ব্যাপারে উদ্যোগের অভাব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভংগির প্রাধান্য-এর ফলে উদ্যোগী মনোভাব অন্যের জন্য পড়ে থাকে এবং বিরোধের সপক্ষে বিতর্ক সৃষ্টির চেতনার জন্ম নেয়।

গ. উম্মাহ্র সামাজিক সমস্যাবলীর যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার এবং ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্কের অভাব। সামগ্রিক ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে ভাসাভাসা, সংকীর্ণ ও আবেগপ্রবণ মতামতের প্রাধান্য এবং এ সময় মুসলিম মানসের যাচাই বাছাই ছাড়া বা ভুলের দরুণ যে কোন জিনিস গ্রহণে আগ্রহ। এ ছাড়া আরো নেতিবাচক ঘটনাবলী রয়েছে যা সংখ্যায় এত অধিক যে তার বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন দুষ্কর। সুতরাং উম্মাহ্র সমস্যার প্রকৃত জবাব দানের জন্য প্রয়োজনীয় সুস্থ সজীব মন এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা অর্জন এবং উম্মাহ্র সমস্যাবলী সমাধানে সহায়তার লক্ষ্যে সুন্নাহকে আমরা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি? ইসলামী লক্ষ্যের পানে মুসলমানের কাজ করতে ও সংগঠিত হতে এবং সামাজিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়? এর ফলে উম্মাহ্র মধ্যে প্রাণস্পন্দন ও সজীবতা ফিরে আসবে। তদুপরি উম্মাহকে সাংস্কৃতিক বিকল্প এবং বাস্তব সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচী খুজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে তার পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গভীরভাবে প্রথিত ও মহান সভ্যতা ও ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়ার চেতনা জোরদার করবে।

সুন্নাহ্র অতি আক্ষরিক ব্যাখ্যায় বিপদ

মহানবীর সময়ে জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকলক্ষেত্রে সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা পবিত্র কোরআন অনুধাবন করেছে সম্পূর্ণরূপে। কোরআনের এই মু'জিজার প্রভাব দৃশ্যতঃ প্রতিভাত হয়েছে 'উম্মাতুন ওয়াসাতান, (মধ্যমপন্থী জাতি) গঠনে-এটা অন্যদের জন্য সাক্ষী ও পথ-প্রদর্শক যাতে রয়েছে কল্যাণের সমাহার এবং যা কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম। কালক্রমে জনগণের সুন্নাহর অনুধাবন যোগ্যতা হ্রাস

পেলো, অপরদিকে অভিধান ভিত্তিক (Dictionary based) সংস্কৃতি অন্যান্য ব্যাখ্যা ও টিকা-টিপ্পনীর ওপরে প্রধান্য পেল-এবং শেষ পর্যন্ত এটাই একমাত্র মাধ্যম হয়ে পড়লো। ফলে আক্ষরিক দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি হলো যা অভিধান সমন্বিত ব্যাখ্যার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। বিষয়টি এতই বেড়ে গেলো যে, এ ধরনের অভিধানভিত্তিক প্রবণতা স্থান কালের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনেনি। পরিণামে বিভ্রান্তি, কূটতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে উম্মাহ্‌র রেনেসাঁকে বাধাগ্রস্ত করার প্রবণতা জোরদার করেছে। তারা ইসলামকে পুরোনো ভাবমূর্তির সমষ্টি (Collection) হিসেবে গণ্য করতে নিমিত্তস্বরূপ কাজ করেছে, তারা অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অনভিপ্রেত ভিত্তির ওপর এবং তারা মনে করেছে সত্যিকার যে পরিস্থিতিতে একটি হাদিছ রচিত হয়েছে তা বারবার সংঘটিত হতে পারে যেটা বাস্তব জীবনে আসলে অসম্ভব। তাহলে আধুনিক সুন্নাহ্‌ বিশেষজ্ঞগণ কিভাবে এ বিষয়টি সামলাবেন এবং মুসলিম মানসকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন? যারা ইসলামের বাণীকে তার বিষয়বস্তু থেকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলতে এবং তার সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ভূমিকা পবিহার করার ক্ষেত্রে প্রায় সাফল্য অর্জন করেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে মুসলিম মানসকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে? সত্যি কথা এই যে, এসব লোক ইসলামকে ব্যক্তিগত ও আচরণগত বিষয়ে সীমিত করে এনেছে এবং তুচ্ছ ও ভাসা ধারণায় তার দৃষ্টিভংগির সীমা টেনে দিয়েছে এবং প্রথা সর্বস্ব ধর্মে পরিণত করেছে। এ ধরনের দৃষ্টিভংগি সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ধর্মে, জনগণের ঐক্য অথবা সভ্যতা নির্মাণের অনুকূল নয়।

উম্মাহ্‌র পুনরুজ্জীবনে সুন্নাহ্‌র ভূমিকা

নিঃসন্দেহে আমাদের উম্মাহ রেনেসাঁর জন্য একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করছে, যা তাকে মানবতার অগ্রণী দল হিসেবে মধ্যমপন্থী জাতির অবস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। মুসলিম সমাজ প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ করা ব্যতীত এটা অর্জিত হবে না। এর প্রথম কাজ হচ্ছে ইসলামী রেনেসাঁর জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা প্রণয়ন করা।

আজ উম্মাহ দুটি সংস্কৃতির ধারায় প্রতিষ্ঠিত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি-যা ঐতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশমন্ডিত এবং আমদানি করা বিদেশী সংস্কৃতি। মুসলিম মানস এই দুই সংস্কৃতির ব্যাপারে নিস্পৃহ-তাদের পণ্য ব্যবহারেই সন্তুষ্ট এবং নিজের কোন মৌলিক অবদান রাখতে অক্ষম।

উম্মাহ্‌র ইসলামী জীবন পদ্ধতির সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার সংযোগ সাধনের ফলে মুসলিম বিশ্বের কর্মপ্রচেষ্টা সংগঠন

ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে পরিণামে তার প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হবে, আর উম্মাহ্‌কে এই গুরুদায়িত্ব বহনে সহায়তা করবে।

ইসলামী চিন্তাধারায় বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও শক্তিমত্তা অর্জন করতে এবং উম্মাহ্‌র স্বর্ণযুগের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান পুনরুদ্ধারে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলাম, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অফুরন্ত উৎসের প্রতি পুনরায় নজর দিতে হবে এবং সেগুলো পুনরায় বিস্তারিত ও সতর্কতার সাথে এবং সমসাময়িক ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে অধ্যয়ন করতে হবে। এধরনের দৃষ্টিভংগির জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণ আর বিভিন্ন দিককে বিবেচনায় আনার মত ঔদার্য। এর লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে হবে, মৌলনীতির সংজ্ঞা দিতে হবে এবং জরুরী প্রয়োজন মিটানো এবং উম্মাহ্‌র ভিত্তি যেসব উপাদান নিয়ে গঠিত সেগুলি পুনর্গঠনের জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

পবিত্র কোরআন আমাদের পূর্বপুরুষদের একটি চমৎকার বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো দিয়েছিল। এর ফলে তারা বিভিন্ন জাতির উত্থান, সভ্যতার উত্থান ও পতন সংক্রান্ত আইন অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। যার ফলে তারা বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে ও গভীরভাবে তথ্যাদি যাচাই করতে সক্ষম হয়েছিলো। এটা ছিল এক যৌক্তিক দৃষ্টিভংগি যা কল্পনা নয় বাস্তবতাকে সমন্বিত ও তর্কাতীতভাবে আলোচনা করে। এই দৃষ্টিভংগি ইতিহাসের গতিময়তাকে সামনে রেখে সমাজের অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ব্যাখ্যা করে কখন ও কিভাবে এগুলি ঘটে, ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা কিভাবে করা যেতে পারে, এগুলি থেকে কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা যায় এবং এগুলি কিভাবে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশন দিতে পারে এবং সম্ভাব্য ঘটনা ঘটার আগেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম করে তোলে সেই দৃষ্টিভংগি রাখা।

উপসংহার

মহানবীর (সঃ) সুন্নাহ্‌, তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের জীবনধারা সেই লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর বাস্তব প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা বাদবাকী সৃষ্টিকুলের সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষের জীবন সংগঠন ও নির্দেশনা দিতে সক্ষম একটি চূড়ান্ত পদ্ধতির মাধ্যমে এক সুষ্ঠু যুক্তিধর্মী মন নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন করলেই বুদ্ধিবৃত্তিক মহাসংকটের সমাধান আমাদের আওতায় এসে যাবে।

একইভাবে সুন্নাহ্ এবং মহানবী (সঃ) কর্তৃক পবিত্র কোরআনের বাণীর ও মানুষের জীবনে তার হুবহু রূপায়নের উদ্দেশ্যের সঠিক অধ্যয়ন আমাদের উম্মাহ্র অজ্ঞতা, ঘৃণা, বিরোধ এবং শক্তির অপচয়ের অবসান ঘটাবে। এভাবে সমকালীন মুসলমানরা আধুনিক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জটিলতা দেখে তাদের স্ব-আরোপিত অসামর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং সঠিক ও চূড়ান্ত ইসলামী শিক্ষার অনুধাবনের মাধ্যমে মানবতাকে সত্যিকার নির্দেশনা ও কল্যাণ উপহার দিতে পারবে। এ ধরনের অনুধাবন অভিযোজিত বিধিমালা থেকে অপরিবর্তনীয় নীতির পার্থক্য করতে সহায়তা করবে এবং লক্ষ্য ও উপায় নির্দেশ করবে।

কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ

ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল

সতর্কতার সঙ্গে পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে এবং বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভংগি জানার প্রচেষ্টা চালালে দেখতে পাওয়া যায় এমন বহুসংখ্যক আয়াত আছে, যাতে বিজ্ঞান নিয়ে সার্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি চারটি শ্রেণীতে পড়ে যা বিজ্ঞানের চারটি ক্ষেত্রের অনুরূপ। প্রথম শ্রেণীতে আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞানের বাস্তবতা, তার পরিধি ও লক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, যেগুলি বিজ্ঞানের দর্শন হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের পদ্ধতি বিজ্ঞান। তৃতীয় ভাগে রয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বেলায় প্রযোজ্য আইন। চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কৃত সূত্রসমূহ যে গুলোতে জীবনযাত্রার উন্নয়নে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে মানুষ কাজে লাগাবে। এই ক্ষেত্রটি ফলিত বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত।

সন্দেহ নেই, এর প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামান। বিজ্ঞানের দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে, অপরদিকে পদ্ধতি বিজ্ঞান সত্য উদঘাটনের কার্য প্রণালী প্রণয়ন করে যেমন সুনান বা বিশ্ব জগতের প্রকৃতি ও আইন-যা দুনিয়া জাহান, বিশ্ব ও জীবনযাত্রা পরিচালিত করে এবং যথাসময়ে তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। পরিণামে এসব আইন ও পদ্ধতি মানুষকে এমন ফর্মুলা দেয় যা তাকে সৃষ্টির বৈচিত্র অনুসন্ধানে সক্ষম করে তোলে। ফলে মানবতার অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য এগুলি হয় উপকরণ; হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন একঘেয়েমী থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম এবং তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয় বেশী পরিমাণে, যা তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক করেছে। এভাবে সে আল্লাহর খলিফা হিসেবে এবং বিশ্বের সভ্যতা ও কল্যাণ আনয়নে তার ভূমিকা পালনে আরো বেশী সক্ষম হয়।

এ কথা সত্য যে, পবিত্র কোরআন বিজ্ঞান গ্রন্থ অথবা অন্য কোন পাঠ্য বই হিসেবে নাজিল হয়নি। একইভাবে এটাও সত্য যে, কতিপয় আধুনিক চিন্তাবিদ জোর দিয়ে বলতে চান যে, কোন কোন আয়াতের বৈজ্ঞানিক অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে যা তার লেখকের (আল্লাহর) ইচ্ছা ছিল না। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে কতিপয় চিন্তাবিদ আরেক চরম পর্যায়ে গিয়ে বলেন, বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে কোরআনের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই।

এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, কোরআনী এবং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত (data) সামঞ্জস্যপূর্ণ ও একই ধরনের (সাধারণ অর্থে এবং আপেক্ষিক বাস্তবতার বাইরে ও পরিবর্তনশীল) এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এদের মধ্যে কোন মতানৈক্য বা বিরোধ নেই। সর্বোপরি এগুলি এসেছে অভিন্ন উৎস আল্লাহ থেকে। আর আল্লাহ হচ্ছেন এই বিশ্বজাহান ও তার মহাজাগতিক বিধি ও পদ্ধতির উদগাতা, কোরআন নাযিলকারী এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তদপুরি আইন প্রণয়ন ও কোরআন নাজিল প্রক্রিয়ায় মানুষ একটি পক্ষ। সে হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা যে আল্লাহর জন্যেই সভ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। কোরআনের বাণী এবং মহাজগতিক বিধির মধ্যেকার অপরিহার্য সম্পর্কের প্রকৃতির ব্যাপারে কোরআন গুরুত্ব আরোপ করে। এই বিশ্ব জগত সম্পর্কে অনুধাবন এবং তার আইন ও পদ্ধতি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা না চালানো পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষা কাঠামোর আওতায় মানুষ পৃথিবীতে তার ভূমিকা পালন করতে পারে না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক শতাব্দীর তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ বা প্রত্যাখ্যান করে না। বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, বিষয় তার ধারণার চাইতে ব্যাপক হতে পারে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলার সুযোগ তার নেই।

একথা স্বীকার করার পর বিজ্ঞান তার সীমিত পরিসরে আরো নিশ্চিতভাবে বলে, মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন যদি তার এক বৃহৎ পরিসর ছিনিয়ে নেয়া হয় যা বস্তু ও গতির বাইরে বিস্তৃত। বিজ্ঞান এখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সে এখন ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও পরমাণু বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ এবং মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে মানুষের অনুধাবনের ফলে বিজ্ঞান দর্শনে এই বিরাট বিপ্লব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দু (Core) আবিষ্কার করতে গিয়ে গবেষণায় দেখা গেল বস্তুগত প্রতিবন্ধক (Material barrier) ভেঙ্গে গেছে এবং ফলতঃ প্রাকৃতিক বিশ্বের কাঠামো ও গঠনের পশ্চাতে আধ্যাত্মিক পরিধি প্রকাশ পেল। এখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম বহুক্ষেত্রে নতুন করে সামঞ্জস্য খুঁজে পেলো[২৬]। সূতরাং বিজ্ঞানের চারটি ক্ষেত্র এবং কোরআনে বিধৃত উপাত্তের (data) মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি আমরা একটুখানি দৃষ্টিপাত করলে কি দেখতে পাই[২৭]?

(১) বিজ্ঞান দর্শন, তার লক্ষ্য এবং ইসলামের মৌলনীতি ঃ

বিজ্ঞান যা অর্জন করতে চায় এবং প্রথমতঃ মানুষের সভ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সাথে তার সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বজাহান, যে বিশ্বে

সে বাস করে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভংগি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার সাথে বিজ্ঞান দর্শন জড়িত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয় কোন বিলাসিতা বা গঠন বিষয় নয়। এর কারণ হলো উম্মাহর কার্যক্রম, পৃথিবীতে তার মিলনের প্রকৃতির এবং বিশ্বজাহান জীবন, বিশ্ব ও মানুষের ব্যাপারে তার সার্বিক বিশ্বাসের সাথে এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এখানে ইসলামিক জীবনধারা এবং বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভংগির ব্যাপারে কতিপয় মৌলিক নীতির উল্লেখ করা সম্ভবতঃ প্রয়োজন। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্যে অনাবিষ্কৃত বিধি ও পদ্ধতি এবং যেসব পন্থায় এগুলি বাস্তবায়ন করা হয়-এসব নীতি তার ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়। এসব নীতি জোরদার করতে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী দৃষ্টিভংগীর মৌলিক উপাদানসমূহের ঘোষণা করা, বিশ্বের সাথে এগুলির সংযোগ সাধন এবং সভ্যতার প্রতি সক্রিয় অবদান রাখার উপযোগী করার ক্ষেত্রে এ ধরনের দৃষ্টিভংগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মতে বৈজ্ঞানিক তৎপতার সাথে চারটি মৌলিক নীতি রয়েছে ঃ

(ক) ইসতিখালুফ (খলিফা)

মানুষের কাছে যে ঐশী আমানত রয়েছে সেটাই হচ্ছে খেলাফত অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। পবিত্র কোরআন ও হাদিছে উল্লিখিত খলিফার নীতি হচ্ছে সেইসব নীতির অন্যতম যা বিজ্ঞান বাস্তবতা হিসেবে সমুন্নত রেখেছে।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিকাশ, সভ্যতার সৃষ্টি, তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, অভাবমুক্ত নিরাপদ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি যা আরো উচ্চতর সাফল্যসহ সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে যাওয়ার অনুকূল হতে পারে ইত্যাদি করতে পারে।

মানুষ পূর্বে উল্লিখিত মহাজাগতিক বা ঐশী সুনান আবিষ্কার করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার না করা পর্যন্ত খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন অথবা অব্যাহত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে যথেষ্ট নিশ্চয়তা এবং সাহায্য লাভ করতে পারে না। শুধুমাত্র তক্ষুণি সে জ্বালানীর রিজার্ভে 'প্লাগ' লাগাতে পারে এবং তার পরিবেশ ও তার মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় ঘটাতে পারে। এটা ছাড়া খলিফার নীতি শূণ্য শুধু তত্ত্বকথা হিসেবেই রয়ে যাবে।

(খ) তাওয়াজুন (ভারসাম্য)

ইসলামী জীবন ও চিন্তার অন্যতম নীতি হচ্ছে মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রয়োজনের মধ্যে তাওয়াজুন বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এটা

কোরআন সুন্নাহ্য় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধাঁচে ও প্রকারে তা আলোচিত হয়েছে।

আমরা এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একটি স্বতঃপ্রকাশিত তথ্য উপেক্ষা করে এসেছি। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের দায়িত্বের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীকে তার অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানুষকে একটি বিশেষ প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার চাহিদা পূরণের জন্য পৃথিবীকে তার অনুগত করে দিয়েছেন অথচ অন্যান্য ঐশী ধর্ম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছে-ইসলাম এ মত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে। এরূপ করতে গিয়ে তারা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে মানুষের মন-মেজাজের চাহিদা এবং তার প্রতি অনুগত করে দেয়া পৃথিবীর নেয়ামত এবং সুযোগ-সুবিধার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা টেনে দেয়া হয়েছে।

সত্য কথা এই যে, মানুষের এই দু'প্রকার চাহিদার মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য ছাড়া ইসলামী জীবন চলতে পারে না। তবে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবতার মধ্যে বাস করা এবং উত্তেজনা, বিচ্যুতি বা নির্যাতনমুক্ত থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানব জীবন গঠন করা যা হবে কর্মতৎপর, পরিবর্তনশীল ও গতিময়। এতদসত্ত্বেও এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগি, যা পৃথিবীর আর কোন মতবাদ বা ধর্ম একই রকম সার্বজনীনতা ও অঙ্গীকার নিয়ে গ্রহণ করেনি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রয়োগ ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হতে পারে না।

(গ) তাসখীর (আনুগত্য)

বিশ্বজগত এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগির এটি আরেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভংগির বাস্তবায়ন করার ও তার মহান সুপ্তশক্তির অনুধাবনের আগেই নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ইসলামী দৃষ্টিভংগি অনুসারে প্রকৃতি ও বিশ্বজগতে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মৌলিক কর্তব্যের উপযোগী করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তব ও কার্যকর পন্থায় মিথস্ক্রিয়ার যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহ তার আইন, পদ্ধতি ও সামর্থের বিধান জারি করেছেন।

এই মিথস্ক্রিয়া প্রসঙ্গে ইসলাম একটি মধ্যম পন্থার প্রস্তাব দেয়ার পক্ষপাতি। এটা মানবতাকে এই নীতি জানাতে চায় যে, প্রকৃতি মানবিক প্রয়োজনের সেবায় নিয়োজিত। তবে একইসাথে মূল্যবোধ, নীতি ও কনভেনশান প্রতিষ্ঠার সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনের দুইদিকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার একটি স্থিতিমাপ (Parameter) নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর লক্ষ্য

হচ্ছে মানুষের উচ্চাকাংখা, নীতি ও বিশ্বজগতে তার অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উদ্ভাবন ও সভ্যতার গুনাগুণ অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া।

এতেও যদি বিজ্ঞানের সুপ্তশক্তি তথা পদ্ধতি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের তথ্য ও প্রয়োগের সদ্ব্যবহার করা না যায়,তাহলে কোন ইসলামী সমাজ তাসখীর এর নীতি বাস্তবায়ন এবং তাকে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতায় রূপান্তরিত করতে পারবে না।

(ঘ) সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক

বিশেষভাবে ইসলামী জাগতিক দৃষ্টিভংগি এবং সাধারণভাবে ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতির বাস্তবায়নে বিজ্ঞানকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সৃষ্টির আশ্চর্যজনক পদ্ধতি এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের মধ্যে এটা প্রয়োজনীয় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অনেকেই সৃষ্টির মু'জিজা সম্পর্কে লিখেছেন। বহু বিজ্ঞানী ও পন্ডিত বিজ্ঞানের একটি অমোঘ সত্য উদঘাটনে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং সে সত্য হচ্ছেঃ সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছে। এই বিষয়টির চূড়ান্তভাবে সমাধান করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন রাখা হয়নি।

যেহেতু বিশ্বজগত পরিচালিত হয় সাংগঠনিক কার্যক্রম, নির্ভুল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গতি ও গঠনমূলক আন্তঃসম্পর্ক দ্বারা, আর সবই সমাধান হয় গাণিতিক সতর্ক বিচার ও বৈজ্ঞানিক ফর্মুলার সাহায্যে, তাই অসংখ্য প্রমাণ ও বেশুমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি একটি অতি প্রাকৃতিক, সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী এবং মহানির্দেশকের ইচ্ছা (Directing Will) থেকে সূচিত[২৮]।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতদিন বিশ্বজগত, পৃথিবী ও জীবনের গোপন রহস্য অনুসন্ধানের জটিল তৎপরতায় নিয়োজিত থাকবে ততদিন ইসলামী জীবনের জন্য তা অপরিহার্য হয়ে থাকবে। তাছাড়া অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে এটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টার কাছে নিয়ে যায় এবং স্রষ্টামুখী হলেই তা এবাদতের কার্যক্রমে চলে যায়।

(২) পদ্ধতি বিজ্ঞান

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন বিশ্বজগতের বিধি-বিধান আবিস্কারের জন্য একটি পদ্ধতি বিজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করে। এটা একটি নমনীয়, চূড়ান্ত পদ্ধতি বিজ্ঞান যা সময় এবং স্থানের প্রেক্ষাপটে কখনও অস্থিতি হয় না। কারণ এটা মূলতঃ গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য একটি পদ্ধতি বা হাতিয়ার। সুতরাং এটা

আপেক্ষিক পরিবর্তনের উর্ধ্বে থাকে এবং প্রত্যেক যুগে ও পরিবেশে অক্ষুণ্ন থাকে। পবিত্র কোরআন মানুষকে তাদের অস্তিত্ব এবং বিশ্বজগতে তাদের স্থান সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি নিয়ে চিন্তার আহ্বান জানায়। এজন্যে তাদেরকে জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মন ও বিশ্ব জগতের দিগন্ত ঈমানের[২৯] উচ্চতর পরিধিতে মানুষের কি চমৎকার মনোভাব তা পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের চেতনা কাজে লাগাবার আহবান জানানো হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কোরআন গবেষণা, ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৃহীত পদক্ষেপের ব্যাপারে চেতনাসমূহের প্রতি মৌলিক দায়িত্ব দিয়েছে।

পবিত্র কোরআন আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে মানুষকে তার সকল ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে অফুরন্ত উপাত্ত (data) গ্রহণের আহবান জানিয়েছে যাতে করে তার উপলব্ধিজাত ক্ষমতা মহাসত্যের কাছে পৌছার লক্ষ্যে তাদেরকে তালিকাভুক্ত, বাছাই, গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। মহাসত্যের নিয়মে বিশ্বজগতে আইনের ঐকতান রয়েছে।

অনুসন্ধান, পরীক্ষা, আরোহী যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেধা ও ইন্দ্রিয়সমূহ যৌথভাবে কার্যকর। এই কার্যকারিতার দায়িত্বের ভিত্তিতে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে, কেননা অন্যান্য জীবিত প্রাণী থেকে সে অপরিহার্যরূপেই পৃথক। পবিত্র কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে যেখানে বারবার বলা হয়েছে শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয়ের অনুভূতি (আল ফুয়াদ) যৌথভাবে মানব জীবনকে তার মূল্য ও অনন্যতা দান করেছে। মানুষ যদি এসব শক্তিকে সক্রিয় করে তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে তাহলে সে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষস্থানে পৌছে যাবে। এর ফলে সে বিশ্বজগতের প্রভু বনে যাবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার অবস্থান সুদৃঢ় করবে। অপরদিকে, সে যদি এসব শক্তিকে কাজে না লাগায় তাহলে তার পর্যায় হবে নিকৃষ্টতম এবং আল্লাহ যখন তাকে শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয়ের অনুভূতিসহ পৃথিবীতে পাঠান তখন এ ধরনের অবস্থা তার জন্য নির্ধারণ করে দেননি।

এছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি আয়াত রয়েছে যাতে মানুষকে তার বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত করার আহবান জানানো হয়েছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ যার সাহায্যে তার প্রতি ঈমান বৃদ্ধি করা যায়। তদুপরি এসব আয়াতে মানুষকে তার চারপাশের ঘটনাবলী গভীরভাবে উপলব্ধি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

গভীর চিন্তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা জ্ঞানার্জনের বেলায়ওপ্রযোজ্য; কারণ এটা হচেছ গভীর চিন্তার বাইরে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ এবং এর

ফলাফল মাত্র। জ্ঞানার্জনের ফলে মানুষ তার চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা লাভ করে এবং তার সত্তা ও বিশ্বজগতের সাথে তার সম্পর্কের পরিধির ব্যাপারে গভীর উপলব্ধি অর্জন করে। এর ফলে তার উপলব্ধির ক্ষমতা সবসময়ের জন্য খুলে যায় এবং তার সামনে উপস্থাপিত পত্যেক সমস্যা, ঘটনাবলী বা বিষয় দায়িত্বশীলতার সাথে সমাধানের পথ নিশ্চিত হয়।

মানুষ যাতে আরোহ, তুলনা, ভারসাম্য ও পরীক্ষার মাধ্যমে এবং সম্মত বাহ্যিক উপাত্তের (Agreed external data) সমর্থনে ও অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে সুষ্ঠু ফলাফল লাভ করতে পারে সেজন্য পবিত্র কোরআন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি-প্রমাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের ন্যায় পদ্ধতি সমূহের ওপর গরুত্ব আরোপ করেছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পবিত্র কোরআন, 'ইলম' (জ্ঞান/বিজ্ঞান) শব্দটি ব্যবহার করেছে কয়েকটি অর্থেঃ (ক) দ্বীন[৩০] (ধর্ম/জীবন ব্যবস্থা)-যা আল্লাহ্ তার নবী রসূলদের ওপর জারী করেছেন এবং মহাসত্যসমূহ-যা এ আয়াতসমূহে বিধৃত। নাযিলকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধের লক্ষণ হিসেবেও 'ইলম' এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এভাবে কোরআনের ভাষায় 'ইলম'এবং দ্বীন একই ধরনের শব্দার্থ বহন করে। আল্লাহ্র আয়াত এ শিক্ষাই দিয়েছে এবং আমাদের কে ব্যাপক আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত চেতনা অনুধাবনে সক্ষম করে তোলে যা প্রত্যক্ষবাদীদের (positivists) তথ্যানভিজ্ঞ ও বিদ্বেষদুষ্ট উৎপন্ন অর্থের পরিবর্তে 'ইলম' ও 'দ্বীন' এর অর্থ প্রচারিত হোক বলে তিনি চান। সাড়ে সাতশোরও বেশী আয়াতে 'ইলম' শব্দের বিবিধ শব্দরূপ ও ব্যুৎপন্ন শব্দ রয়েছে।

প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী অধ্যয়নে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি গ্রহণের ওপর পবিত্র কোরআন জোর দিয়েছে এবং বিদ্বেষপ্রসূত, তথ্যানভিজ্ঞ মতামত, যাদু ও কুসংস্কারের ন্যায় দৃষ্টিভংগির ব্যাপারে নেতিবাচক ক্রিয়া করে এমন প্রতিটি বিষয় সে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। দ্বীন মানুষকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে সিরাতুল মোস্তাকিমের পথে চলার আহবান জানায়, এধরনের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবগুলি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত। আমরা সবাই জানি, সরল পথ হচ্ছে দুটি পয়েন্টের মধ্যেকার সংক্ষিপ্ততম দূরত্ব। সুতরাং এ থেকে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি হলে দূরত্ব ও কষ্ট বাড়ায় এবং পর্যটকদের এতটা বিভ্রান্ত করতে পারে যে, তারা কখনো গন্তব্যস্থলে নাও পৌছতে পারে। পবিত্র কোরআন পুনঃপুনঃ একটি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার তথ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলে যে বিদ্বেষ থেকে অর্থহীনত্ব ও নির্বুদ্ধিতার সৃষ্টি হয় এবং সত্যের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে ভুল।

৩. ঘটনাসমূহ

পবিত্র কোরআনের পেশ করা তৃতীয় ব্যাপ্তির (dimension) মধ্যে রয়েছে ঘটনাসমূহ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পদ্ধতির সমাহারঃ জোতির্বিদ্যা, ভূগোল, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মানুষের শরীরতত্ত্ব ---। এক্ষেত্রে বহু আধুনিক চিন্তানায়ক দুটি বিরোধপূর্ণ অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাত্তের (data) ব্যবহারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকা যায়। ফলে পদ্ধতিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে যায়। অপরদিকে আংশিক উপাত্ত (partial data) ব্যবহার করা হয় একটি সাধারণ রুলিং এর জন্য, পরিবর্তনশীল উপাত্ত কালে লাগানো হয় স্থায়ী রুলিং প্রদানের জন্য এবং আপেক্ষিক উপাত্ত (relative data) ব্যবহার করা হয় নিরঙ্কুশ রুলিং দানের জন্য। এই দৃষ্টিভংগির দুর্বল দিক হচ্ছে যদি এসব আংশিক ও আপেক্ষিক বৈজ্ঞানিক উপাত্তের পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং বৈজ্ঞানিকরাই স্বীকার করেন যে এটা হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম যে ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রবক্তারা এ ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় ভুগবেন।

এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াবার প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় অবস্থানও (position) সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক উপাত্ত প্রত্যাখ্যান করে ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফাঁদে পড়ে যায়।

সুস্থ পদ্ধতি বিজ্ঞানের নিকটতম দৃষ্টিভংগি হচ্ছে মধ্যম পন্থা যা কোরআন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুসরণ করতে শিক্ষা দেয়। পরিবর্তনীয় উপাত্তসহ (variable data) বিজ্ঞানের প্রতি কখনই পরিপূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ হয় না এবং এরই সাথে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা রয়েছে তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যনও করে না। পবিত্র কোরআনের সমকালীন দক্ষ চিন্তানায়ককে কোরআনের আয়াত এবং বৈজ্ঞানিক অভিসন্দর্ভ সমীকরণের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য নিজস্ব বিশেষায়িত ক্ষেত্রে তার মেধা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সক্ষম হতে হবে। তদুপরি সম্প্রতি প্রকাশিত কোরআনের তাফসীরের কতিপয় আধুনিক ধারা সম্পর্কে তাকে অবহিত হতে হবে। এসব ধারায় কোরআনের অর্থ ও বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য কোরআনের পরিভাষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার করে-যা 'আল তাফসীর আল বায়ানী লী আল কোরআন' নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে বাস্তব নিশ্চয়তা রয়েছে যা বাক্য ও বাক্‌ধারার কাংখিত অর্থলাভের প্রচেষ্টায় তাফসীরকারককে অতিরঞ্জন বা ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। বৈজ্ঞানিক বিশেষায়ন ও আল তাফসীর আল বায়ান-এর মধ্যেকার এই ভারসাম্য কোরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতের কাংখিত অর্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা আধুনিক চিন্তাবিদকে সক্ষম করে তোলে। এমন কতিপয় বৈজ্ঞানিক ঘটনা রয়েছে যা চূড়ান্তরূপে অথবা অবিসংবাদী, স্বতঃপ্রকাশিত সত্য হিসেবে বিধানে পরিণত হয়েছে। যেমন বৃষ্টি

আনার ক্ষেত্রে বাতাসের ভূমিকা, সৌর জগতের পরিক্রমায় মাধ্যাকর্ষণের ভূমিকা, ভ্রুণের গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গ্যাসিয় পদার্থের দূরত্ব হ্রাস বৃদ্ধির ফলে অনুপাতের পরিবর্তন। এগুলি ছাড়াও আরো বহু তথ্য রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সাথে কোরআন নাজিলের সময়কার আরবরা পরিচিত ছিল না। এসব তথ্য সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতের তাফসীরকালে গত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্বতঃপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং এজন্যে কোরআনের বহু আশ্চর্যজনক দিকের একটি প্রকাশ করেছে।

এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা বাস্তবতার একাধিক বিষয় প্রকাশ করে। তবে এসব বিষয় একটি একক, নমনীয় কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান। এটা কোন কোন সময় কোরআনের অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে নির্দেশ করা যায় অন্য আয়াতের সম্পর্কে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য। এর ফলে বিশ্বজগতের বিস্ময়কর কাঠামো জোটবদ্ধ রয়েছে এবং একটি পদ্ধতির সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে প্রমাণিত বিধি ও স্বতঃপ্রকাশিত সত্যের বাইরে যেসব তত্ত্ব এখনও আলোচনা ও মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলি খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং আধুনিক চিন্তাবিদদের উচিৎ হবে না আলোচিত আয়াতের ব্যাপারে কোন প্রকার আলোকপাত করা।

নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক উপাত্তের (data) ক্ষেত্রে সাবধানে অগ্রসর হতে হবে এবং (ক) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকার এবং (খ) পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের সম্ভাব্য ভ্রান্তি এড়াতে হবে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি পরিপূর্ণ অঙ্গীকারের ফলে সুষ্ঠু অনুধাবন, সচেতনতা এবং সকল পর্যায়ে আরো অনুসন্ধান ব্যাহত হবে। অপর দিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের ফলে অনুধাবনের ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং আধুনিক মানুষ ও কোরআনের তথ্যের এক বিষয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল দাঁড় করাবে। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রমাণ হিসেবে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানভিত্তিক উপাত্ত পবিত্র কোরআনের সর্বত্র ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, কোরআনের উল্লিখিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বিষয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মুজিজা হবে, এমন কথা নেই। অথবা নাজিলের সময় এ বিষয়টি কারো অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। দু'ধরনের আয়াত রয়েছে; এক ধরনের আয়াতে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং মহাকাশ, বিশ্ব এবং জীবন আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। এ ধরনের আয়াত প্রত্যেক যুগের ন্যায় কোরআন নাজিলের সময় পরিচিত তথ্য ও বিস্ময়কর ঘটনা পেশ করে। অন্য আয়াতগুলি নাজিলের সময় অপরিচিত বৈজ্ঞানিক তথ্য, পদ্ধতি এবং সুনানের নির্দেশক যা বিজ্ঞান পরবর্তীকালে প্রকাশ

করে দিয়েছে। এধরনের বৈশিষ্ট্যকেই কোরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজা ও বিস্ময়কর প্রকৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

স্মরণ রাখতে হবে, কোরআন যেহেতু কোন বৈজ্ঞানিক পাঠ্য গ্রন্থ নয়, সেজন্য সব রকম বৈজ্ঞানিক তথ্য এতে বিধৃত নেই। তবে এতে কতিপয় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইংগিত দেওয়া হয়েছে। এতে গবেষকদের উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, ফলে মানুষ আরো ব্যাপক তথ্যাদি আবিষ্কার করার স্বাধীনতা পায়। তবে কোরআনের মতে, মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের মাধ্যমেই এসব আবিষ্কার করতে পারে।

৪. প্রয়োগ

কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্কে চতুর্থ বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় কোরআন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং প্রতিটি স্তরে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কার কাজে লাগানোর জন্য অহর্নিশ তাগিদ দিয়েছে। এটা এক প্রশস্ত, নমনীয় ও অহর্নিশ অবস্থা যা মানুষের প্রতি আহবান জানায় স্থান-কাল নির্বিশেষে বৈজ্ঞানিক উপাত্ত থেকে উপকৃত হবার এবং সমকালীন সভ্যতায় তার কাজে লাগাবার জন্য। যদি এ রকম ঘটে এবং পরিচিত বৈজ্ঞানিক ঘটনা ও সভ্যতার কোন প্রকার উন্নয়ন হয় তাহলে কোরআন কার্যকরভাবে আবেদন জানাবে প্রত্যেক বংশধরকে নতুন ঘটনা ও নতুন পরিস্থিতির আলোকে পরিবর্তন সাধনের জন্য। কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার এই সম্পর্কের চতুর্থ ব্যাপ্তিতে দেখা যায় কোরআন অহর্নিশ ও নিঃশর্তভাবে ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানায়, বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কার ও ফর্মূলার অধিকতর সদ্ব্যবহার করতে। নিজেদের মালামাল রক্ষা এবং পৃথিবীতে তাদের ভূমিকা সমুন্নত রাখার জন্য কোরআন শত্রুদের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার এবং তাদের প্রতি তীব্র আঘাত হানার আহবান জানায়নি। এ থেকে কি প্রশস্ত, নমনীয় দৃষ্টিভংগির প্রতিফলন ঘটে না, যদ্দরুন তাৎক্ষণিকতার সাথে সার্বজনীনতার এবং স্থায়ীত্বের সাথে ক্ষণস্থায়ীত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিটি কাল ও স্থানে প্রয়োগ করা যায়?

> আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশী শক্তিশালী ও সদাসজ্জিত বাঁধা ঘোড়া তাদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে রাখ যেন তার সাহায্যে আল্লাহর এবং নিজের শত্রুদের ভীত শংকিত করতে পার (৮ঃ৬০)।

নিরঙ্কুশ শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রকে এ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের লৌহ (সুরাহ হাদিদ) অধ্যায়ে এই খনিজ ধাতুকে

শান্তি ও যুদ্ধকালে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে এর ব্যবহার ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ

> আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যেন, লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং আমরা লোহাও অবতীর্ণ করেছি উহা যুদ্ধের জন্য (উপকরণ) এবং লোকদের জন্য এতে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই, যেন আল্লাহ্ তায়ালা জানতে পারেন কে তাকে না দেখেই তার ও তার রসূলগণের সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে খোদা বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী (৫৭ঃ২৫)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ধাতুর নামে একটি সমগ্র সূরার নামকরণের ফলে পৃথিবীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর হতে পারে? বিজ্ঞানীর অন্তরে যে ঈমান পোষণ করা দরকার, সে ঈমান থেকে উৎসারিত আচরণ ও নীতিকে ইসলাম একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছে এবং উপরোক্ত আয়াতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সৃজনশীল ও শিক্ষিত, মার্জিত রুচি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর চেয়ে সুস্পষ্ট অনুমোদন কি হতে পারে? তদুপরি এই আয়াতে লৌহকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র মহা দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে এতে লোহার দুটি সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা বলা হয়েছেঃ ভয়াবহ যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে লোহা যখন অস্ত্র তৈরী ও সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় এবং সুবিধাদি (benefits) (মানুষ শান্তিকালীন গঠনমূলক তৎপরতায় এই খনিজ থেকে যে সুবিধা পেয়ে থাকে) যুগ যুগ ধরে শান্তি ও যুদ্ধকালে লোহার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্পর্কে আর কি বলার প্রয়োজন আছে? বর্তমান কালে মানবতার কল্যাণে অথবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় এটা অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণে পরিণত হয়েছে। লৌহ সমৃদ্ধ যে কোন আধুনিক দেশ শত্রুর গভীর অভ্যন্তরে আঘাত হানতে পারে। কারণ অস্ত্র তৈরীতে লোহার রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় শক্তি। তাছাড়া শিল্প ও সম্পদের চালিকাশক্তি হিসেবে এই দেশ একই সাথে প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

লৌহের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি একটি সূরাহ্র নামকরণ করা হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে সূরা সাবার আয়াতসমূহ। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে (আঃ) লোহা নমনীয় করার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তার রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন। মানবতাকে উন্নত কলাকৌশল শিক্ষাদান

প্রসঙ্গে এ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জুলকারনায়েন এর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। মজলুম জনগণের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে এবং আসন্ন হামলা থেকে তাদের রক্ষা করার তওফিক কামনা করে তিনি বলেন,

> "আমার খোদা আমাকে যাহা কিছু দিয়েছেন তাহা প্রচুর। তোমরা শুধু খাটুনী করে আমার সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে ধাঁধ নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমাকে লৌহখন্ড এনে দাও। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান, পূর্ণরূপে ভরে দিলেন তখন লোকদের বল্লেন, এখন আগুনের কুন্ডলী উত্তপ্ত কর। শেষ পর্যন্ত যখন (এই লৌহ প্রাচীর) সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত লাল হয়ে উঠলো তখন তিনি বল্লেন, আনো, আমি এখন ইহার উপর গলিত তামা ঢেলে দিব। এভাবে তা লংঘন করার অথবা তা খোঁড়ার ক্ষমতা তাদের রইলো না (১৮ঃ৯৫-৯৭)।

পবিত্র কোরআন মানুষ, প্রকৃতি ও অতি প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে এক অনন্য সমন্বয়ের চিত্র এঁকেছে। এতে মানুষের সেবায় পার্থিব শক্তির আনুগত্য ও রূপান্তর এবং আল্লাহর এবাদত সম্পর্কে এক ভারসাম্য টানা হয়েছে। এতে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রকৃতির বাস্তব দিকের ব্যাপক বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। একদিকে মানুষের শক্তি ও বাস্তব সম্ভাবনা এবং অন্যদিকে প্রাণীকূলের তুলনায় তার অবস্থান, তার দুর্বলতা এবং আল্লাহ্‌র ওপর স্থায়ী নির্ভরশীলতা দেখানো হয়েছে। মানুষের বস্তুগত ও স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণে নীতিভ্রষ্ট হওয়ার প্রবণতাকে সংযত প্রহরায় রাখার প্রয়োজনের ওপর কোরআন সবসময় গুরুত্ব দিয়েছে।

আমরা দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল তোমরাও। আমি তার জন্য লৌহকে গরম করেছিলাম। এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমরা তা দেখি। আর আমরাও সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। আমরা তার জন্য গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতিপয় জ্বিন তার সামনে কাজ করতো তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য

করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির আস্বাদন করাব। তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউস, সুদৃশ্য বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করতো। হে দাউদ পরিবার কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। যখন আমরা সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন শুধু ঘুন পোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করলো। সোলায়মান যখন মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। (৩৪ঃ১০-১৪)

অপর এক সূরায় বলা হয়েছে ঃ

"সোলায়মান বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে কেউ পেতে না পারে। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে ছিলাম যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো যেখানে সে পৌঁছাতে চাইতো। আর সকল শয়তানকে তার অধীন করেদিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং অন্য আরো অনেককে অধীন করে দিলাম যারা আবদ্ধ থাকতো শৃঙ্খলে। এগুলো আমার অনুগ্রহ; অতএব কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও-এর কোন হিসাব দিতে হবে না" (৩৮ঃ৩৫-৩৯)।

কোরআনে আরো বলা হয়েছেঃ

"অতঃপর আমরা সোলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আমরা পর্বত ও পরীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এ সমস্ত আমরাই করেছিলাম। আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি শোকর গুজার হবে? এবং সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তার আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ দান করেছি। আমরা সব বিষয়েই সম্যক অবগত

> আছি। এবং অধীন করেছি শয়তানের কতককে যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য আরো অনেক কাজ করতো। এদের নিয়ন্ত্রণে আমরাই ছিলাম।" (২১ঃ৭৯-৮২)

এসব আয়াত হচ্ছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ্‌র উচ্ছার ব্যাপারে সক্রিয় সাড়া দিয়ে গায়েব (Unseen), খোদার ক্ষমতা, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সমাজ বিকাশের পদ্ধতির প্রতি সর্বোচ্চ সংহতি প্রকাশ করছে। এখানে মানুষের সেবায় গায়েবী শক্তি সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে কাজ করছে, আর মানুষ এসব অকৃপণ দানের জন্য তার এবাদাত, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা রুজু করছে আল্লাহ্‌র প্রতি যাতে পৃথিবীতে যেজন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়।

> "আমি জীন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার বন্দেগী করবে। আমি তাদের নিকট কোন রিজক চাই না, এও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে (৫১ঃ৫৬-৫৭)"।

এখানে আমরা আল্লাহর দু'জন নবী, দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এর সাক্ষ্য পেলাম। প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তি ও মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য খোদার শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে কোন সময়সীমা (Time limit) বা স্থানের প্রতিবন্ধকতা (Place barrier) নেই এবং এর সামনে বিজ্ঞান চূড়ান্ত পর্যায়ে অসহায়। লৌহ, বায়ু, গলিত তাম্র জিন-এসব শক্তিকে অনুগত করে দেয়া হয়েছে যাতে দায়িত্বশীল, খোদাভীরু মানুষের নির্দেশে এগুলো পরিচালিত হতে পারে এবং শিল্প ও শিল্পকর্ম গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজ বিকাশের লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন। লোহা ও তামার সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ টেনে পবিত্র কোরআনে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যা আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যবহারযোগ্য এবং নির্মাণ, শিল্পায়ন ও প্রতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহী আধুনিক সভ্যতা বা যে কোন সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ হযরত দাউদকে (আঃ) অকারণেই লৌহ দান করেন নি; তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে তা ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। তদুপরি বায়ুর প্রসঙ্গ ভুলে গেলে চলবে না। ভৌগোলিক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে প্রাণের বর্ধন ও বিকাশের জন্য বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

অন্যান্য বহু আয়াতের ন্যায় এসব আয়াতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত জবাবস্বরূপ যারা অভিযোগ করেন যে, ঐশী ধর্মের একমাত্র কাজ হলো তার অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয়তার দিকে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে

এভাবে প্ররোচিত করে যে গড়ে তোলার জন্য নয়, বরং এই পৃথিবী হচ্ছে কোনক্রমে কাল ক্ষেপণের গলিপথ, এসব লোকের কাছে ধর্ম হচ্ছে সভ্যতা বিরোধী এবং ঈমান হচ্ছে সৃজনশীলতা, আবিষ্কার নবজীবনের প্রতি বাধাস্বরূপ। তারা আরো বলেন, মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যেকার সম্পর্কের ফলে নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়। তারা দাবী করেন জীবনের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য নৈয়ায়িত প্রত্যক্ষবাদী ধারারই (Positivist School) রয়েছে গতিশীল ভূমিকা। এই ধারণা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

এই সমীক্ষায় এমন বহু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় কোরআন পুরোপুরি পরাজিত মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তা ধর্ম ও প্রগতিকে শত্রুতে পরিণত করার পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রকৃত-পক্ষে খোদাভীরু হওয়ার অর্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে সরে যাওয়া বুঝায় না কিংবা এমন কাজ করতে হয় যার কোন প্রতিযোগিতার মূল্য নেই। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। এক্ষেত্রে ইসলাম জীবন ও ইতিহাস প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

টীকা

১। সুবহানাহু ওয়া তা'আলাঃ আল্লাহর প্রশংসা এবং তার সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকুক। আল্লাহ্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়।

২। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঃ মহানবীর (সাঃ) ওপর আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নামোচ্চারণের সময় এই দরুদ পাঠ করা হয়।

৩। আলায়হিস সালাম ঃ তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। অন্যান্য নবীদের বেলায় এই দোয়া পাঠ করতে হয়।

৪। আয়াত ঃ কুরআনের আয়াত। খোদার কুদরত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৫। ফকিহ (বহুবচন/ফুকাহা) ঃ ফিকাহ্শাস্ত্রে পন্ডিত ব্যক্তি, এরূপ আলিম (বহুবচন উলামা) অর্থ ইসলামী পন্ডিত।

৬। আল-নাসিখ (বাতিল) ঃ কুরআনের এমন আয়াত যার বিষয়বস্তু অন্য একটি আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে, এজন্য এদের বলা হয় মান্সুখ।

৭। বিন আশুর; শায়খ মুহাম্মদ আল তাহার; তাফসীর আল তাহ্রীর ওয়া আল তানবীর, আল দার আল তিউনিসিয়া, তিউনিস, ১৯৮৪ পৃঃ ২৮-২৯।

৮। ফিকাহ ঃ আইন কানুনের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান; ইসলামের আইন বিজ্ঞান; উসূলে ফিকাহ; ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স বিজ্ঞান অর্থাৎ ইসলামী আইনের উৎস থেকে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং এসব আইনের আওতা বা পরিধি নির্ণয়।

৯। হাদিস (বহুবচন আহাদিস) রসূলে করিম (সঃ) এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাক্য ও কর্মের সমষ্ঠির নাম হাদিস। ইংরেজী H (Carpital-H) অক্ষর দ্বারা রসূলের হাদিসের সমষ্ঠি বুঝায়। হাদিসের পন্ডিতদের মুহাদ্দিসীন বলা হয়।

১০। বিন আশুর; প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১২।

১১। উসুলিয়্যুন ঃ 'মৌলবাদী' হিসেবে কদর্থ করা হয় এবং 'বিশুদ্ধবাদী' হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। এর প্রকৃত অর্থ, বিশুদ্ধবাদী এবং তাদেরকেই এ বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়, যারা কুরআন ও সুন্নাহর

ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যার প্রতি অনুরক্ত এবং যারা ইজতিহাদ এর প্রতি অনুরক্ত নন (১৬ নম্বর টীকা দেখুন)।

১২। বিন আশুর, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪।

১৩। তাওহীদ; খোদার একত্ববাদ; এই ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ এক, সার্বভৌম, বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত সৃষ্টিকুলের মালিক। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামের নির্যাস।

১৪। সুন্নাহ ঃ রসূলে করিমের (সঃ) কাথিত, সম্পাদিত ও অনুমোদিত বা অনুনোমদিত কার্যের সমষ্টি।

১৫। Methods of understanding the Quran, IIIT Virginia, 1991 Herndon.

১৬। ইজতিহাদ ঃ ইসলামের বিচার সংক্রান্ত উৎস, সর্বকাল ও স্থানের জন্য অপরিবর্তনীয়। মুসলিম সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এ সমস্ত সূত্রের সুশৃঙ্খল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা যেতে পারে।

১৭। ইমাম (আ'ইম্মাহ্ বহুবচন) ঃ ইসলামী জ্ঞানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ের সমাজ নেতা, ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকারীকেও ইমাম বলা হয়।

১৮। সনদ (আসানিদ বহুবচনে) ঃ কোন সুনির্দিষ্ট হাদিসের বর্ণনাকারী দল। আল-মুসনাদ; হাদিসের বর্ণনকারীদের ক্রমানুসারে যে কোন হাদিসের সংকলন; যেমন মুসনাদ আবু দাউদ।

১৯। মুহাদ্দেসীনঃ ৯ নং টীকা দেখুন।

২০। মুনতাহিদুনঃ ১৬ নং টীকা দেখুন।

২১। আহাদঃ যে সমস্ত হাদীস শুধু একজন বর্ণকারি সুত্রে বর্ণিত।

২২। ফতওয়া ঃ ইসলামী অইনের সাথে সম্পৃক্ত কোন আলেম, মুফতি বা মুজতাহিদের দেয়া আইনানুগ রায়।

২৩। কায়রো ও বৈরুতের 'দারুর সুরূক' প্রকাশিত।

২৪। সীরাত ঃ মহানবীর (সঃ) এ জীবন গ্রন্থ।

২৫। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সুন্নাহর ব্যাপারে গবেষণা পরিচালনার নীতি অনুসারে 'ইনস্টিটিউট আম্মান ভিত্তিক' রয়্যাল সোসাইটি ফর দি স্টাডি

অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন'-এর সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটির ৭ম সাধারণ সম্মেলনকালে "মহানবীর সুন্নাহ ঃ জ্ঞান ও সভ্যতা বিনির্মাণে তার পদ্ধতি" বিষয়ে আয়োজিত এই সেমিনারে ১২৬ জন পন্ডিত, অধ্যাপক এবং গবেষক যোগ দেন সেমিনার আলোচিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে শেখ আল গাজালীর এবং ড. আল কারদাবীর সুন্নাহ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ (আগে উল্লেখিত) এবং অন্যান্য নিবন্ধও ছিল।

২৬। এসব বিষয়ে আমার 'আলম ফি মুয়াজাহাত আর মাদ্দিয়াহ (বস্তুবাদের মুখোমুখি বিজ্ঞান) গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে বৈরুত মুয়া'সাসাত আল রিসালাহ, ১৯৮৬।

২৭। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মদীয় গ্রন্থ 'মাদখাল ইলা মাওফীক আল কুরআনুল করিম মিনাল ইল্‌ম' (বিজ্ঞানের প্রতি কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা), বৈরুত, মুয়া'সাসাত আল রিসালাহ, ১৯৮৩, এখানে পাঠক বিষয়ভিত্তিক কুরআনের পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স পাবেন।

২৮। খিলাফাহ ঃ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, রসূলে করিম (সঃ) এর পার্থিব সরকারের ধারবাহিকতায় সরকারের বিধান। খলিফাহ্ (খুলাফাহ বহুবচনে) ঃ আল্লাহর প্রতিনিধি।

২৯। ঈমান ঃ আল্লাহ-ই একমাত্র খোদা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার শেষ নবী-এই বিশ্বাস রাখা।

৩০। দ্বীন ঃ মানুষের জন্য জারী করা আল্লাহর স্বাভাবিক বা প্রকৃত ধর্ম যাতে রয়েছে ঈমান, নীতি, আইন, ভক্তি, বিধি-বিধান ও বিচার।

সাময়িক গবেষণা সিরিজ
(The Occasional Papers Series)

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট'এর প্রকাশনা কর্মসূচী ইতিমধ্যেই ইসলামী চিন্তাধারা ও জ্ঞানের ইসলামীকরণ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ১১ টি প্রধান সিরিজের বেশ কিছু বই বিভিন্ন ভাষায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ঃ

Dessertations; Human Development; Islamic Methodology; Islamization of Culture; Islamization of Knowledge; Issues in Contemporary Islamic Thought; Lectures; Occasional Papers; Perspectives on Islamic Thought; Research Monographs; and Studies in the Islamization of Knowledge.

ইনস্টিটিউটের লন্ডন অফিস কর্তৃক প্রকাশিত The Occasional Papers Series এ ইনস্টিটিউটের বিশ্বব্যাপী কর্মসূচী এবং নিবন্ধ উপস্থাপনে আগ্রহী মুসলিম পন্ডিতগণের গবেষণাপত্র, নিবন্ধ ও বক্তৃতামালা স্থান পেয়েছে।

এগুলি পুস্তিকার আকারে পেশ সহজপাঠ্য এবং 'রেফারেন্স' হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রস্তাবিত কর্মপন্থা ও সমাধানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করার জন্য ইসলামীকরণের (Islamization) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা শুরুর উদ্দেশ্যে এসব পুস্তিকা ছাত্র, পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সিরিজ অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ করা হচ্ছে।

এ সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ The Quran and the Sunnah: The Time-Space Factor মূলতঃ আরবীতে লিখিত তিনটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই তিনটি নিবন্ধ হচ্ছে The Quran : The Primary Source of Knowledge; Toward a Proper Reading of the Sunnah ডঃ ইউসুফ আল কারাদাবীর *কায়ফা নাতা আ'মাল মা'আল সুন্নাহ আন নাবাবিয়াহ* (সুন্নাহ অনুধাবনের পদ্ধতি) এর মুখবন্ধ হিসেবে লেখা ডঃ আল আলওয়ানীর অভিযোজিত রূপ এবং The Quran and Modern Science: Observations on Methodology. শেষোক্ত নিবন্ধটি The American

Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 8. No.1, March. 1991 এ একটি আলাদা সংস্করণে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। এ তিনটি নিবন্ধের ইংরেজী সংস্করণও IIIT-এর অনুবাদ বিভাগ তৈরী করেছে। আমরা হুদা খতিব এবং ইউসুফ বাড় এর অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার IIIT--র অন্যতম নীতি। ব্যবহৃত বেশ ক'টি পরিভাষা অনুবাদযোগ্য নয়; অপরদিকে অন্যান্যগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনস্টিটিউট মনে করে ইসলামী বিষয়সমূহ সুষ্ঠু অনুধাবনের জন্য এগুলোর সাথে পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। এসব পরিভাষা ফুটনোটে বা বন্ধনীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর যে সমস্ত পরিভাষা ইংরেজী অভিধানে গৃহীত হয় নি তা Italic এ আছে। এরকম ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় পাঠকদের পাদটীকার সহায়তা নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আই আই আই টি

লন্ডন

১৪১২ হিজরী / ১৯৯১

গ্রন্থকারদ্বয়ের পরিচিতি

ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী

ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী ১৯৩৫/১৩৫৪ হিজরীতে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ও আইন কলেজ থেকে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৫৯/১৩৭৮ হিজরীতে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬৮/১৩৮৮ হিজরীতে এম এ ডিগ্রী এবং ১৯৭৩/১৩৯২ হিজরীতে উসূল-ই-ফিকাহ্ এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী নেন।

প্রায় দশ বছর (১৯৭৫/১৩৯৫ থেকে ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ) ড. আল আলওয়ানী রিয়াদে ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ্ ও উসূল-ই-ফিকাহ্ এর প্রফেসর ছিলেন।

ডঃ আল আলওয়ানী ১৯৮১/১৪০১ হিজরিতে যুক্তরাষ্ট্রে International Institute of Islamic Thought এর প্রতিষ্ঠা পর্বে যোগ দেন।

তিনি মক্কা ভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; ১৯৮৭/১৪০৭ হিজরী থেকে জেদ্দার OIC ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমীর সদস্য এবং ১৯৮৮/১৪০৮ হিজরী থেকে উত্তর আমেরিকার ফিকাহ্ পরিষদের সভাপতি।

ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স সংক্রান্ত তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর আল মাহসুর ফি ইল্‌ম উসূল আল ফিকাহ্ [উসূল-ই-ফিকাহ্‌র সংক্ষিপ্ত সার] এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ৬ খন্ডের বই।

আল ইজতিহাদ ওয়া আল তাকলীদ ফি আল ইসলাম। [ইসলামে আইনগত যুক্তি ও অনুকরণ]

হুকুক আল মুত্তাহাম ফি আল ইসলাম [ইসলামে অভিযুক্তের অধিকার]

আদব আল ইখতিরাফ ফি আল ইসলাম [ইসলামের মত পার্থক্যের নীতি]

উসূল আর ফিকাহ্ আর ইসলামী [ইসলামী আইনশাস্ত্রের উৎস পদ্ধতি] এটা ফরাসী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

ডঃ ইমদদাদ আল দীন খলিল ঃ

ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল ১৯৩৯ সালে ইরাকের মোসুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৬২ সালে বি এ এবং ১৯৬৫ মালে বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে এমএ ডিগ্রী নেন। এরপর তিনি মিসরের আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৬৮ সালে ইসলামের ইতিহাসে কৃতিত্বসহ পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মোসুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পরিচালক (১৯৬৬-৬৭) ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৭ সাল অবধি ইসলামের ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি ও ইতিহাস দর্শন শিক্ষাদান করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি পুরাকীর্তি বিভাগের চেয়ারম্যান, সাংস্কৃতিক জাদুঘর লাইব্রেরীর পরিচালক এবং জাদুঘর ও পুরাকীর্তির সাধারণ পরিদপ্তরের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। তিনি বর্তমান ইরাকের আরবিল-এ সালাউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর।

প্রফেসর খলিল বিভিন্ন আরব বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন এবং ইসলামিক শিক্ষা,বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ISESCO) প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে প্রবন্ধ লিখেছেন। ইসলামী চিন্তাধারা, পদ্ধতি বিজ্ঞান ও ইতিহাস এবং সাহিত্য ও সমালোচনামূলক সাহিত্যে তিনি ৫০টিরও বেশি গ্রন্থ লিখেছেন।

ছেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (বাগদাদ ১৯৭১) সীরাত ও সুন্নাহ সংক্রান্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন (কাতার, ১৯৭৯) অন্যতম।

বিআইআইটি'র কিছু বাংলা প্রকাশনা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট